Bhalobasha Nao Hariye Jeo Naa by Sunil Ganguly

ভালবাসা নাও,
হারিয়ে যেওনা
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

একদিন সকালবেলা বাজার করে ফিরছি, দেখি যে গলির মোড়ের মিষ্টির দোকানের কাছটায় একটি ছেলে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে ছেলেটির বয়েস চোদ্দ-পনেরো হবে, ধ্যারেঙ্গা মতন গড়ন, কালো হাফ-প্যান্ট আর ময়লা গেঞ্জি পরা, খুব সম্ভবত কোনো বাড়ির চাকর। ইদানিং যাদের বলে 'কাজের লোক'।

কান্নার আওয়াজ নানা রকম হয় দুঃখ ও বিষাদের যেমন অনেক রকম স্তর আছে। সে যাই হোক, ছেলেটির কান্নার মধ্যে ফুটে উঠছিল গভীর অভিমান।

চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেরা চেঁচিয়ে কাঁদে না। ঐ বয়েসে আত্মসম্মান বোধ প্রখর হতে শুরু করে, দুঃখ-টুঃখগুলো সব গোপন হয়ে যায়, বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে একটা বেপরোয়া, তেজী বাব জাগে।

ছেলেটির কণ্ঠস্বর গোল মতন, নিটোল। তার কান্নার আন্তরিকতায় আমার বুকে একটা ধাক্কা লাগে। আমি থমকে দাঁড়ালুম।

ফুটো ঘটি থেকে গড়িয়ে পড়া জলের মতন আজকাল কলকাতার সব বাজারই আশপাশের রাস্তা ও গলিগুলিতে ছড়িয়ে থাকে। আমাদের বাজারের এই পেছনের গলিটায় দু'পাশেও নানা রকম আনাজপত্তরের সওদা নিয়ে ছেলে-মেয়ে বুড়ো-বুড়িরা বসে। সেই সব দোকানে কেনাকাটি চলছে, লোকজন যাচ্ছে আসছে, কেউ একটা প্রশ্নও করছে না শুধু একটি বুড়ি ডিমওয়ালী খানিকটা অসহায় ভাবে বসে আছে।

তা হলে ছেলেটির কান্না কারুকে শোনাবার জন্য নয়। শুদু যদি নিজেরই জন্য হয় তা হলে একটা নিভৃত জায়গা খুঁজে নেয় নি কেন?

আমি বুড়ি ডিমওয়ালীকে জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে ওর?

একজন কথা বলার লোক পেয়ে বুড়ি যেন বাচঁলো সে তড়বড় করে বললো, দ্যাখো তো বাবা, আমি কী করবো? ও ছেলেটা একটা কুড়ি টাকার নোট আমায় দেখিয়েছিল সে কথা ঠিক। আমি কেন মিছে কথা বলবো বলো? তারপর ঐ দোকানদার বলছে সে কথা মানি না। তা এখন আমি কী করি? আমার কথা যদি না শোনে-

ডিমওয়ালী বুড়ির বয়েস অন্তত সত্তর তো হবেই। কথা বলার ধরনটি বেশ মিষ্টি এবং স্পষ্ট আমি এর কাছ থেকে কোনো দিন ডিম কিনিনি, আগে কখনো দেখেছি কিনা তাও খেয়াল নেই তার কথা শুনে ঘটনাটা ঠিক বোঝা গেল না।

আমি ছেলেটির দিকে ফিরতেই সে কান্না আর্দ্ধেকটা থামিয়ে বললো, আমি এখন কী করে বাড়ি যাবো? আমাকে মারবে। আমাকে তাড়িয়ে দেবে। আমি কোনো দোষ করিনি-

জিজ্ঞেস করলুম, কী হয়েছে?

ঘটনাটা এইঃ ছেলেটি কোনো বাড়ির চাকর ঠিকই। সে কুড়ি টাকার একটা নোট নিয়ে বাজার করতে এসেছিল। প্রথমে সে ডিমওয়ালীর কাছ থেকে ছ'টা ডিম নেয়। ডিমওয়ালী জানায় যে তার কাছে কড়ি টাকার ভাঙানি নেই, সকাল থেকে তার

বিক্রি হয়েছে মাত্র সাড়ে চার টাকা। তখন ছেলেটি তাকে বলে যে, বাজার করে ফেরার পথে সে দাম দিয়ে যাবে। এর পরে ছেলেটি যায় বাজারের গেটের দোকানের পাশেই এক স্টেশনারি দোকানে। সেখানে সে এক প্যাকেট বিস্কুট কেনে দু'টাকা পঁচাত্তর পয়সা দিয়ে। দোকানটিতে বেশ ভিড় ছিল। সেই দোকানদার অন্যান্য খদ্দেরদের সামলাতে সামলাতে এই ছেলেটিকে ফেরৎ দেয় শুধু দু'টাকা পঁচিশ। ছেলেটি জিজ্ঞেস করে, আর টাকা? দোকানদার বলে, আবার কিসের টাকা? তুই তো পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিস!

একজন প্রতিষ্ঠিত দোকনদার বনাম একটি চোদ্দ–পনেরো বছরের বাড়ির চাকর। এখানে কার কথা বিশ্বাসযোগ্য? ছেলেটি খানিকটা চ্যাঁচামেচি করেছিল দোকনার তাকে ভাগিয়ে দিয়েছে। অন্য খদ্দেররা মাথা ঘামায় নি। ছেলেটির একমাত্র সাক্ষী ঐ বুড়ি ডিমওয়ালী। এসব ক্ষেত্রে কেউ সাক্ষী দিতেও চায় না। কিন্তু এই বুড়ি উঠে গিয়ে বলেছিল, দ্যাখো বাবা, আমি অন্য কিছু জানি না। তবে এই ছেলেটা আমায় একটা কুড়ি টাকার নোট দেখিয়েছিল বটে। আমার ডিমেরও দাম বাকি আছে সেই জন্য। দোকানদার এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করেছে।

বাজারের অন্য কেনাকাটি দূরে থাক, ছেলেটি এখন ডিমের দামও শোধ করতে পারবে না। তার মনিব ও মনিবানী 'আচ্ছা যা হয়েছে তো হয়েছে, ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না, এই নে আর একটা কুড়ি টাকা', এমন কথা বলারও মানুষ নয় মনে হচ্ছে।

অধিকাংশ ঘটনাতেই আমার ভূমিকা দর্শকের। আমি কোনো সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারি না। রাস্তায় ঘাটে অনেক ঘটনাই দেখবার আধ ঘন্টা বা এক ঘন্টা পরে মনে হয়, ইস, তখন এই কথাটা তো বলা যেত!

আমি পাড়ার মাস্তান নই, সমাজসেবক নই, কোনো রাজনৈতিক দলের আঞ্চলিক কমিটির সদস্যও নই। সুতরাং বাজারে একটি দোকনদারের সঙ্গে কোনো বাড়ির চাকরের কী ঝামেলা হয়েছে, সে ব্যাপারে আমার কোনো দায়িত্ব থাকার কথা নয়। মধ্যবিত্তদের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী গা বাঁচিয়ে সরে পড়াই উচিত ছিল। কিন্তু, আমি কোনো বাড়িতে চাকরের কাজ না করলেও আমারও তো এক সময় পনেরো বছর বয়েস ছিল। ছেলেটিকে দেখে আমার সেই বয়েসের কথা মনে পড়ে। সেই বয়েসে আমিও অনেকবার বঞ্চিত হয়েছি, বিনা দোষে ভর্ৎসনা সহ্য করেছি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি ছেলেটিকে বললুম, চল তো আমার সঙ্গে। দেখি দোকানদারটা কী বলে!

ডিমওয়ালী বুড়িটি বিনা আমন্ত্রণেই আমাদের পিছু নিল।

একটা চোদ্দ–পনেরো বছরের চাকর–চেহারার ছেলে আপন মনে কাঁদলে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু একজন প্যান্ট–শার্ট পরা, সিগারেট–ফোঁকা, ভদ্রলোক চেহারার মানুষ তার পক্ষ নিয়ে কথা বললে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। দোকানটির সামনে কী হয়েছে, কী হয়েছে বলে বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে গেল।

দোকনদারটির চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। খাড়া নাক। মাথার চুল তেল চকচকে। মুখে কোনো রকম অপরাধীর ভাব নেই। স্পষ্ট চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বলুন।

আমি চোটপাট না করে নম্র ভাবেই বললুম, দেখুন, এই ছেলেটি বলছে..

—ও কি আপনার বাড়িতে কাজ করে?

—না, তা নয়, ও কাঁদছিল, সেই শুনে আমি..

আমাকে থামিয়ে দিয়ে দোকানদারটি বললো, ও বাজে কথা বলছে। আমার ঠিক মনে আছে, ও পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিল।

—কিন্তু ও আগে এক জায়গায় কুড়ি টাকার নোট..

—বুড়িটাকে ও কুড়ি টাকার নোট দেখিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ওর কাছে যে আর একটা পাঁচ টাকার নোট ছিল না তার কোনো প্রমাণ আছে? ওরা এইরকম করে, বুঝলেন? বুড়িটাকেও ডিমের দাম দিত না, অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যেত..

দোকানদারটির কথার ওজন আছে, চট করে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভিড়ের মধ্য থেকে দু'একজন আলগা উক্তি করলো, আজকাল কারুকেই বিশ্বাস নেই!

ছেলেটি তার প্যান্টের দু'পকেট উল্টে কান্না কান্না অভিমানী গলায় বললো, এই দেখুন, আমার কাছে আর কিছু নেই, একটা শুধু কুড়ি টাকার নোট..

দোকানদারটি বললো, ও আমি বিশ্বাস করি না!

তারপর অন্য খদ্দেরকে জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে কী দেবো?

আমি বললুম, দেখুন, আপনারও তো ভুল হতে পারে। আরও অনেক খদ্দের ছিল..

দোকানদারটি কাউন্টার থেকে খানিকটা ঝুঁকে এসে বললো, শুনুন ভাই, এই সব দোকনে সব সময় পাঁচরকম লোক আসে, আমাকে লোক চরিয়ে খেতে হয়, নজর রাখতে হয় সব দিকে। আমি জানি কে কী রকম! আপনি যে ঐ ছোঁকড়াটার কথা বিশ্বাস করছেন, আপনি কোনো প্রমাণ পেয়েছেন? ও যে ঠক্‌বাজ নয় তা আপনি কী করে বুঝলেন?

সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর দিতে পারলুম না। প্রমাণ? কিছু নেই! ছেলেটির কান্না আমার কাছে খাঁটি মনে হয়েছে, এই যা। কিন্তু যুক্তি-তর্কের মাঝখানে কান্নার প্রমাণ খাটে না। দোকানদারটির ব্যক্তিত্বের কাছে আমি পরাজিত হয়ে গেলুম।

একটা ঘটনার মধ্যে ঢুকে পড়েও এই ভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবো?

আমার অ্যাপ্রোচটাই ভুল হয়েছে। প্রথমেই এসে দোকানের কাউন্টারে প্রকাণ্ড একটা কিল মেরে আমার বলা উচিত ছিল, শালা, গরিবকে ঠকাচ্ছো? এক্ষুণি যদি ক্যাশ না ছাড়ো তো তোমার দোকান একেবারে চৌপাট করে দেবো! এ পাড়ায় ব্যবসা করছো...।

আমার চেহারা খারাপ নয়। গুণ্ডা হিসেবে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়। একবার ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে যদি বলা যায়, ঢাকবো আমার লোকজনদের? তা হলেই ভিড় একদম ভোঁ ভোঁ হয়ে যেত। আজকাল এই ধরনের কথা শুনলে কেউ আর ট্যাঁ ফোঁ করে না। পনেরো টাকা কেন, দোকানদারটি একশো পনেরো টাকা দিয়ে দিতেও রাজি হয়ে যেত!

কিন্তু আমার যে এরকম নাটক করার অভ্যেস নেই। একদিনের চেষ্টাতে পারাও যায় না।

বাজার করে ফেরার সময় পকেটে টাকা থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাকে বাড়ি থেকে দিয়েছে একশো টাকার নোট। বাজার খরচের ওপর দু'টাকা আমার নিজস্ব কমিশান সরিয়ে রেখে বাকি টাকা ফেরৎ দেবার কথা। আজ না দিয়ে কাল দিলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

একটা কিছু তো করতে হবে। আমি পকেটে হাত দিয়ে বললুম, এই খোকা, আমি তোমাকে পনেরোটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি। বাড়িতে গিয়ে দ্যাখো, হয়তো কিছু ভুল হয়েছে।

টাকাটা বার করতে আমার বিষম লজ্জা হচ্ছিল। অনেকেই আমাকে দেখছে। আমার কথায় কি একটা গর্বের সুর ফুটে উঠেছে। এরা কি আমাকে মহৎ টহৎ কিছু ভাবছে? মাত্র তো পনেরোটা টাকা!

দোকানদারটি অন্য খদ্দেরদের সামলাতে সামলাতেও লক্ষ্য রাখছিল আমাদের দিকে। এব্বারে সে বললো, না, না, ও কি কথা? আপনি টাকা দেবেন কেন? সে কোশ্চেন তো উঠছে না! আমি বলেছি, আমার ভুল হয় নি।

আমি বললুম, ঠিক আছে।

দোকানদার একটি দশ টাকা ও একটি পাঁচ ;টাকার নোট ছুঁড়ে দিল ছেলেটির গায়ে।

ছেলেটি সেই টাকাই কুড়িয়ে নিল, ফিরিয়ে দিল আমার টাকা। আর কথা না বাড়িয়ে আমি প্রস্থানে উদ্যত হলুম। ডিমওয়ালী বুড়ি এতক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ, এবারে সে সমস্ত মুখ ও চোখ দিয়ে মধুর ভাবে হাসলো।

তখন তাকে মনে হলো খুব চেনা চেনা।

সব তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকার ঘটনা কিন্তু আমরা একেবারে ভুলে যাই না। কোনো কোনো ঘটনার রেশ থেকে যায় মনের মধ্যে।

সেদিন বাজার থেকে ফেরার পথে আমি বেশ উৎফুল্ল বোধ করেছিলুম অনেকক্ষণ।

ঐ যে চোদ্দ-পনেরো বছরের চাকরটি, তাকে যদি কেউ সাহায্য না করতো তা হলে ঘটনামোড় নিতে পারতো কত দিকে। ঐ ছেলেটি বাজার থেকে বাড়ি ফিরলে শুধু এক প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে, আর চোখে জল। ও যে বাড়িতে কাজ করে, ধরা যাক, সে বাড়িতে দাদাবাবু আর বৌদি দু'জনেই অফিসে কাজ করেন। তাঁদের একটা খোকা বা খুকি স্কুলে যায়। সকালবেলা সবাই খুব ব্যস্ত। উনুনে ভাত চাপানই আছে। ছেলেটা বাজার করে আনলেই কোনো রকমে খানিকটা মাছ-তরকারি রান্না করে, খাওয়া সেরেই কর্তা-গিন্নী দাঁড়াবেন মিনিবাসের লাইনে। এর মধ্যে যদি ছেলেটি খালি হাতে, একটা অদ্ভুত গল্প সঙ্গে নিয়ে ফেরে, তাহলে কার মেজাজ ঠিক থাকে।? একে তো ব্যস্ততা, তার ওপরে মাসের চব্বিশ তারিখে পনেরো টাকার মূল্য কম নয়। হয়তো ওঁরা ঐ ছেলেটিকেই চোর বলে সন্দেহ করতেন। রাগারাগি, বকাবকি...তারপর স্বামীটি হঠাৎ ওকে মারতে উঠলে স্ত্রী বাধা দিয়ে বলতেন, থাক, ওসবের দরকার নেই! তুই বিদেয় হ, তোকে আর আমাদের লাগবে না, তুই এক্ষুণি চলে যা!

বিনা দোষে চুরির অপবাদ নিয়ে চাকরি গেল ছেলেটির। অপমানে, অভিমানে সে ফুঁসতে লাগলো। এর পর কি সে আত্মহত্যা করবে? না। মধ্যবিত্ত বাড়ির পনেরো

বছরের ছেলে পরীক্ষায় ফেল করলে আত্মহত্যা করেও ফেলতে পারে। কিন্তু ঐ বয়েসের চাকরেরা আত্মহত্যা করে না। তারা অন্য বাড়িতে কাজ খোঁজে। আজকাল চট্ করে ঐ রকম বয়েসের অচেনা ছেলেদের কেউ কাজ দেয় না। রেফারেন্স লাগে। ছেলেটির চোর অপবাদ ছড়িয়ে গেছে, দু'চারটে বাড়িতে ঘুরেও সে ব্যর্থ হলো। তারপর..কাছেই রেলাইন, বস্তি..সে ফিড়ে গেল সমাজবিরোধীদের দলে। ওয়াগন লুট, ছিনতাই, বোমাবাজি, খুন। একটার পর একটা। ছেলেটার নাম আগে ছিল হাবু, পরে হলো হাবু মাস্তান, দু'তিনটে পাড়া তার নাম শুনলেই কাঁপে, পুলিশ তাকে খাতির করে, নানান পার্টির দাদারা কাজে কর্মে তাকে ডাকে। সেই দোকানদারকে সে আগেই খুন করেছে, তারপর একদিন সে তার প্রাক্তন দাদাবাবুর বুকেও পাইপগান থেকে গুলি চালালো..।

এই সব কিছুই ঘটতে পারতো, ঘটলো না শুধু আমার মতন একজন লোকের পাঁচ মিনিট সময় খরচের জন্য। ছেলেটি সুস্থভাবে, ঠিকঠাক বাজার করে বাড়ি ফিরেছে। এ জন্য আমার যদি মনে মনে একটু আহ্লাদ হয়, তাতে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

আবার এ ঘটনাটা এমনও নয় যা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গল্প করা যায়।

কয়েকদিন পর আমি আবার ঐ গলি দিয়ে বাজার করতে যাচ্ছি, সেই ডিমওয়ালী বুড়ি হাতছানি দিয়ে ডেকে বললো, ও বাবা, শোনো, শোনা!

আমি কাছে যেতেই সে খুব অন্তরঙ্গ সুরে বললো, সেদিনকার সেই ছোঁড়াটা, যাকে তুমি টাকা দিতে চাচ্ছিলে, সে তো আর একদিনও এলো না! তোমার মনে আছে সেদিনকার কথা?

হ্যাঁ, ঘটনাটি আমার পুরোই মনে আছে, ছেলেটির মুখও মনে আছে। কিন্তু ছেলেটি এ পথে আর আসে নি, তাতে কী হয়েছে! এই রাস্তায় দোকানদারের সঙ্গে ঝঞ্ঝাট হয়েছিল, তাই সে হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে বাজারে ঢোকে। দোকানদারটিকে ভয় পাওয়াও তার পক্ষে স্বাভাবিক।

কিন্তু বুড়িটি এর পর যা বললো, তাতে আমি রীতিমতন আঘাত পেলুম।

ঠিক অভিযোগের সুরে নয়, খানিকটা যেন নিজের নিয়তিকে দোষ দেবার মতন গলায় বুড়িটি বললো, ছোঁড়াটা আমার ডিমের দাম দিয়ে গেল না? সেদিন গোলে-গণ্ডগোলে কী হলো, সে ছেলে কোথায় চলে গেল, কিছুই বুঝলুম না।

—অ্যাঁ? তোমার দাম দেয় নি? সে তো সব টাকা ফেরৎ পেয়েছিল!

—না বাবা, আমি ভাবলুম পরে বুঝি এসে দিয়ে যাবে। কিন্তু আর তো আসে নি।

আমার মুখখানা নিশ্চয়ই ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। মানুষ চিনতে আমার ভুল হতে পারে, তা বলে কি আমি কান্নাও চিনি না? ঐ ছেলেটির কান্নাটা নকল ছিল? দোকানদারে কথা ঠিক, ঐ ছেলেটা একটা পেশাদার ঠক?

নিজের কাছেই নিজে বোকা বনতে কেউ সহজে চায় না। আমি ঐ ছেলেটাকে বেনিফিট অব ডাউট দিতে রাজি হলুম। হয়তো ওর অসুখ-বিসুখ করেছে। কিংবা ওর বাবুরা ওকে আর বাজারে পাঠাচ্ছে না! পরে একদিন এসে নিশ্চয়ই ডিমের দাম দিয়ে যাবে। অতি বড় প্রতারকও এই রকম একজন বুড়ির টাকা মারতে চাইবে না।

বুড়িটির ঝুড়িতে মোট বারো-চোদ্দটি ডিম। এই কটা ডিম বেচে তার

ক'পয়সাই বা লাভ হয়? এর মধ্যেও যদি ছ'টা ডিমের দাম বাকি পড়ে তাহলে তো তার ক্যাপিটালেই আরও শর্ট পড়ে যায়। বাহাত্তর বছরের এক বুড়ি তো আর সাধ করে ডিম বিক্রি করতে আসে না! নিশ্চয়ই এই ভাবেই তার সংসার চলে। ক্যাপিটাল বেশি থাকলে সে আরও বেশি ডিম কিনে আনতে পারতো। যে মোট বারো চোদ্দটা ডিম বিক্রি করে, সে ছ'টা ডিমের দামপায় নি..।

এবারেই প্রথমে বুড়িটিকে আমি লক্ষ করলুম। রোগা, শুকনো চেহারা হলেও তার মুখের মধ্যে এমন একটা ভাব আছে, যার জন্য তাকে দেখতে ভালো লাগে। সারল্য আর মমতা মিশে আছে। গলার আওয়াজটি শ্রুতি-মধুর। তার পরনের নরুণ পাড় সাদা শাড়িটি খুব ময়লা নয়। এই বুড়িটি রয়েছে দারিদ্র্য-সীমার অনেক নিচে, তবু তার চেহারা ও ব্যবহারের স্নিগ্ধতা দেখে অবাক লাগে।

সেদিন সেই ছেলেটিকে আমি পনেরো টাকা দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আসল ক্ষতি তো হয়েছে এই বুড়িটিরই । ছটা ডিমের দাম সাড়ে চার টাকা, সেটা আমি অনায়াসে দিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু এই জায়গায় আমি একটু কার্পণ্য করলুম।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এই বুড়িটির ক্ষতিপূরণ একা আমাকেই করতে হবে কেন! বাজারে কি আর লোক নেই? আমিও তো গৌরী সেনের বংশধর নই। আমাকেও দু'টাকা পাঁচটাকার জন্য অনেক সময় অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। সেদিন না হয় ছেলেটির কান্না শুনে ঝোঁকের মাথায়..

পকেট থেকে দু'টাকার একটা লাল নোট বার করে এগিয়ে দিয়ে বললুম, এই নাও, তুমি এটা রাখো।

বুড়ি অবাক হয়ে বললো, কেন? এটা কিসের?

—এমনিই। তুমি নাও না, রাখো।

বুড়ি হঠাৎ আঁচল দিয়ে তার চোখ চাপা দিল। সেইরকম ভাবেই রইলো অনেকক্ষণ। আমি অপ্রস্তুত।

বুড়ির এক পাশে বসে আছে একটি কিশোরী,সে বেগুন ও চাল কুমড়ো বিক্রি করে। আরেক পাশে এক পৌঢ় সবজীওয়ালা। এরা আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। আগের দিনের কথাও বোধহয় এরা জানে।

কিশোরীটি বুড়িকে ধাক্কা দিয়ে বললো, ও দিদিমা, নাও না, বাবু তোমাকে এমনি দুটো টাকা দিচ্ছেন।

সবজীওয়ালা আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুতভাবে হেসে মাথা নাড়িয়ে বললো, ও নেবে না! ও নেবে না!

আমি ততক্ষণে লজ্জা পেয়ে টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছি। ঐ যে কিশোরী মেয়েটি দিদিমা বলে ডাকলো, তাতেই আমার মাথায় একটা ঝঙ্কার লেগেছে। আমার নিজের দিদিমাও অনেকটা এরকমই দেখতে ছিলেন। খুব মিল আছে। দিদিমার কথা মনে পড়তেই একটু কষ্ট অনুভব করলুম। শেষ একটা বছর দিদিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, তখন আমি ঘুরছিলুম কাঁহা কাঁহা সাহেবী মুল্লুকে।

চোখ থেকে আঁচল নামিয়ে, বৃষ্টির পর রোদ্দুরের মতন ঝিকমিকিয়ে হেসে বুড়ি

বললো, তুমি দিতে চেয়েয়েছো.. সেই যথেষ্ট – বেঁচে থাকো বাবা.. আমার কোনো রকমে চলে যায়..

এবারে এখান থেকে চলে যাবার জন্য আমি ব্যস্ত হতেই বুড়ি বললো, ডিম নেবে না? তোমার ডিম লাগবে না?

মাছ আর তরিতরকারিই আমি কিনি বাজার থেকে। ডিম একজন লোক বাড়িতে এসে দিয়ে যায় নিয়মিত। বাজার থেকে ডিম নিয়ে যাওয়ার ঝামেলা আছে, ভেঙেটেঙে যেতে পারে।

তবু বুড়িটির কথা শুনে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ নেবো। ছ'টা ডিম রেখে দাও, ফেরার সময় নিয়ে যাচ্ছি।

পাশের কিশোরীটি বললো, আমিও এক কিলো বেগুন রেখে দিচ্ছি!

কলকাতার বাজরে দু'রকম দোকানদার আছে। এক যারা উঁচু বেদীর ওপরে বসে। এদের ফুলকপি বেশি সাদা, বেগুন বেশি চকচকে, লাউ-কুমড়ো বেশি নধর হয়। সব জিনিসের দামও কিছু বেশি। এরা শীতকালে পটল, শরৎকালে কাঁচা আম পর্যন্ত রাখে। বেদীর ওপর যেসব মাছওয়ালা বসে, তারা বিক্রি করে কাটা পোনা, ফ্রাইয়ের ভেটকি, চিতলপেটি, অসময়ের ইলিশ। এরা সব বনেদী দোকানদার।

আর কিছু মাছওয়ালা, তরকারিওয়ালা বসে মাটিতে। এরা বিক্রি করে পার্শে-ট্যাংরা, কুচো চিংড়ি, তেলাপিয়া, গুরজালি ইত্যাদি, আর শাক-সবজী-তরকারিগুলো প্রত্যেকদিন গ্রাম থেকে আনা। অনেক গ্রামের লেকই রোজ এইসব জিনিস বাজারে নিয়ে বসে, ভোরের ট্রেনে এসে দুপুরের ট্রেনে ফিরে যায়।

আমি এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দোকান থেকেই প্রায় সব কিছু কিনি। কিছুটা সস্তার জন্য তো বটেই, তাছাড়া টাটকা জিনিসের লোভেও। মাটিতে চট পেতে যে একটি মাত্র লাউ নিয়ে বসে, আমার ভাবতে ভালো লাগে যে সে ঐ লাউটি আজই তার গ্রামের বাড়ির মাচা থেকে ছিঁড়ে এনেছে, একটু এবড়ো-খেবড়ো চেহারার রং চটা বেগুন দেখলে মনে হয়, ওগুলো আজই কোনো আনাড়ি চাষীর খেত থেকে তুলে আনা। এসব কিছুর মধ্যে পেস্টিসাইডের বিষ নেই। মাছের বেলাতেও তাই। বড় বড় বাগ্‌দা-গলদা চিংড়ি আমার কাছে বেশি আকর্ষণীয়। বিরাট বিরাট মৃত পোনা মাছের কাটা অংশের চেয়ে এখনো কানকো নাড়ছে এমন ছোট কাৎলা আমার পছন্দ।

এই সব ছোট দোকানদাররা অনেকেই আমাকে চেনে। এদের সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ একটা আরাম বোধ করি। কলকাতায় বসেই এইভাবে গ্রামের মানুষের সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ হয়। নাগরিক জীবনের নানান প্যাঁচ- পোঁচের মধ্যে দিন কাটাতে হলেও আজও আমরা সারল্যের জন্য কাঙাল। এই সব গ্রামের নারী-পুরুষরা অনেকেই এখনো সত্যিই বেশ সরল। কত সহজ এদের মন জয় করা যায়। আমি কোনো দিন এদের সঙ্গে দরাদরি করি না বলে এরা আমাকে সব কিছু ন্যায্য দামে দেয়। কোনো জিনিসের হঠাৎ দাম বেড়ে গেলে ওরা নিজেরাই আফশোষ করে। আমি একটা গর্ভমোচা কিনতে চাইলে তার গায়ে দুঃখিত হাত বুলিয়ে পৌঢ় বিক্রেতাটি বলে, একটু দেশি দাম পড়ে যাচ্ছে বাবু, কী করবো, যা দিনকাল!

এরা কেউ জেনেশুনে কক্ষনো আমাকে খারাপ জিনিস দেয় না, তার কারণ একটাই। আমি কোনো দনি এদের জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি, বাছাবাছি করি না। আমি বলি,

ওগো, তুমি নিজের হাতে বেছে দাও তো, তুমি দিলে কী আর খারাপ জিনিস দেবে? ঐ যে কিশোরী মেয়েটি আমার জন্য এক কিলো বেগুন রাখবে বললো, ওর কাছেই আমি আগে আর একদিন বেগুন কেনার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, ও বলেছিল, আজ তুমি অন্য দোকান থেকে নাও, এ বেগুনগুলো তেমন ভালো না, পোকা লেগে গেছে।

এইব লোকজনদের সঙ্গে টুকিটাকি কথা, গ্রামের এক ঝলক জীবনের স্বাদ, দর ওঠা-নামার দুঃখ-সুখ, এইব কিছু মিলিয়ে বাজার করাটা আমার কাছে সকালবেলার বেশ একটা আকর্ষণীয় কাজ, মোটেই বিরক্তিকর লাগে না একদিনও।

সেদিন সেই ছেলেটির সমস্যার মধ্যে মাথা গলিয়ে আমি বেশ একটা আত্মপ্রসাদ বোধ করেছিলুম কিন্তু আজ আমি বেশ লজ্জিত ও অপরাধ বোধ নিয়ে ফিরলুম বাড়িতে। বুড়িটিকে আমি দুটো টাকা দিতে গিয়েছিলুম কেন? দান নিতে না চেয়ে গ্রামের গরিব বুড়িটি যে মহত্ত্ব দেখালো সেই তুলনায় পুরো সাড়ে চারটাকা দিতে না চেয়ে আমি কি অনেক ছোট হয়ে যাইনি?

।। দুই ।।

ডিমওয়ালা বুড়িটির ব্যবহার দিন দিন আমার কাছে খুব রহস্যময় হয়ে উঠছে।

তার সঙ্গে যতবার দেখা হচ্ছে ও কথা বলছি, ততবারই আমি তার সঙ্গে আমার মৃত দিদিমার মিল খুঁজে পাচ্ছি বেশি করে। এবং বুড়িটির ব্যবহারও ক্রমশই আমার দিদিমার মতন হয়ে উঠেছে। আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে যা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। আমার মৃত দিদিমার আত্মা যেন ওর ওপর ভর করেছে, এই রকমভাবে বলা যেতে পারতো, কিন্তু আজকাল কে আর আত্মা-ফাত্তায় বিশ্বাস করে!

বাজারের পেছন দিকটার গলিটাতে ঢুকলেই দেখতে পাই সেই বুড়ি দুটি ব্যগ্র চোখ মেলে চেয়ে আছে। আমাকে দেখতে পেলেই হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার মুখে ফুটে ওঠে হাসি। কাছে গেলে জিজ্ঞেস করে, ও বাবা, তুমি তিন দিন আসোনি কেন? তোমার জ্বর হয়েছিল নাকি? মুখটা শুকনো শুকনো দেখছি!

আমি লক্ষ করি যে এ বুড়ির কণ্ঠস্বর অবিকল আমার দিদিমার মতন!

স্নেহ সব সময় অতিরিক্ত বিপদের আশঙ্কা করে। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মা ছেলেকে বলে, দেখিস যেন গাড়িচাপা পরিস না! আমার দিদিমা প্রায় সব সময়েই আমার কাল্পনিক শরীর খারাপ নিয়ে চিন্তিত হতেন। যদিও আমার জ্বর-জ্বাড়ি, অসুখ-বিসুখ হতেই চায় না। ক'দিন যে একটানা বিছানায় শুয়ে আরাম করবো তার উপায় নেই।

বাবা চাকরি সূত্রে বাইরে থাকতেন, ছেলেবেলাটা আমি দিদিমার কাছেই কাটিয়েছি বেশ কয়েকটা বছর। সেই যে তখন দিদিমা আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথাটি খেয়েছেন, তারপর থেকে আর আমার মাথা ঠিক হলো না।

আমার মামা বাড়ি ভর্তি অনেক লোকজন ছিল। কিন্তু আমার ছিল স্পেশাল খাতির। যেহেতু আমার মা-বাবা দূরে থাকে, তাই অনেকেই আমাকে দুঃখী দুঃখী মনে করতো। আসলে মা-বাবার কাছে থেকে দূরে থাকায় আমার বেশ মজা

হয়েছিল। পড়াশুনোর কড়াকড়ি নেই, দুপুরবেলার গনগনে রোদে ছাদে উঠে ঘুড়িউড়িয়ে চোখ লাল করলেও কেউ বকুনি দেয় না, সবাই বেশি বেশি প্রশ্রয় দেয়, নিয়মিত হাত খরচ পাই, এমন মধুর বাল্যকাল ক'জনের ভাগ্যে ঘটে!

আমাকে আলাদা ভাবে যত্ন করার জন্য দিদিমা লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার দিতেন। দাদু বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু মামারা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবার, সে বাড়িতে খাবারদাবারের কোনো অসুবিধে ছিল না। তবু দিদিমা আমাকে গোপনে গোপনে কিছু খাইয়ে আনন্দ পেতেন। যেমন, বাড়িতে একটা বড় ইলিশ মাছ এসেছে। সেই ইলিশ মাছের ডিমটা ভেঙে দিদিমা একটা প্লেটে করে ঘরে নিয়ে আসতেন আমার জন্য। চুপি চুপি ফিসফিস করে বলতেন, খেয়ে নে, চট করে খেয়ে নে!

বাড়ির অন্যান্য সবাইকে বঞ্চিত করে একা আমার ঐ ডিম ভাজা খাওয়া যে অন্যায়, সেটা আমিও বুঝতুম ঐ বয়েসে। কিন্তু আমার ক্ষীণ আপত্তি টিকতো না। দিদিমা বলতেন, এই রাবণের গুষ্ঠির সবাইকে ভাগ করে দিলে এইটুকু এইটুকু কারুর মুখেও লাগবে না। তুই খা তো! দিদিমার স্নেহের অত্যাচার আমাকে সহ্য করে নিতেই হতো।

কিংবা লক্ষ্মীপুজোর জন্য আগের দিন রাত্তিরে নারকোল নাড়ু তৈরি হচ্ছে। সেগুলো প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হবে। রাত্তিরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিদিমা বলতেন, এই চারটে নাড়ু গরম গরম খেয়ে নে তো! নে, নে, হাঁ কর!

পুজোর আগেই সেই নাড়ু খাবার অধিকার একমাত্র আমারই ছিল।

সেই দিদিমার মৃত্যুকালে আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। তিনি নাকি আমার নাম ধরে ডেকেছিলেন তিনবার।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। এখন বাজারের এই ডিমওয়ালী বুড়ির মধ্যে আমি অবিকল আমার দিদিমাকে প্রত্যক্ষ করি। চেহারা, ব্যবহার, কণ্ঠস্বর সব এক। সেই বুড়ি এমন সুরে আমার সঙ্গে কথা বলে যেন কতকালের আত্মীয়।

তার দুপাশে যে দু'জন বসে, তারাও ব্যাপারটা লক্ষ করেছে। পাতলা হিলহিলে চেহারার কিশোরী মেয়েটি তার ডাগর ডাগর চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাসে। অন্য পাশের পৌঢ়টিও মুচকি হাসে।

কোনোদিন বুড়ি আমাকে আগে লক্ষ না করলে কিশোরী মেয়েটি তাকে খোঁচা দিয়ে বলে, অ দিদিমা, ঐ দ্যাখো তোমার নাতি এসেছে!

বুড়ির মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাকে সহাস্য অভিযোগের সুরে বলে, তুমি কাল এলে না, আমি তোমার জন্য বসে রইলুম সেই কতক্ষণ তোমার অসুখ করেনি তো?

আমি ওর কাছে থেকে চারটে বা দুটো ডিম নিই। বুড়ি দামের হিসেব জানে না। মুখের দিকে চেয়ে থাকে। অন্য খদ্দেররা ডিম কিনলে সে পাশের মেয়েটির কাছ থেকে হিসেব বুঝে নেয়। সে মেয়েটি বেশ তুখোড়। দেড়টাকা জোড়া হলে সাতটা ডিমের দাম বলতে তার এক মুহূর্তও ভাবতে হয় না।

আজকালকার নতুন একটাকা, দু' টাকার কয়েনের তফাতও অনেক সময় ধরতে পারে না বুড়ি। আমাকে প্রায়ই একটাকার বদলে দু'টাকা ফেরত দেয়।

বুড়ির কাছ থেকে আমি ডিম নিই অন্যান্য বাজার শেষ করে ফেরবার সময়।

একদিন দেখি, তার আর সব ডিম বিক্রি হয়ে গেছে, শুধু পাঁচটি ডিম নিয়ে বসে আছে সে আমার জন্য। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই প্রথমে চারটি ডিম তুলে দিল আমার ঝুড়িতে, তারপর বাকি ডিমটি হাতে দিয়ে বললো, এটা আলাদা করে নাও, এটা তুমি খাবে। এটার দাম দিতে হবে না।

আমি বললুম, সেকি! ওটার দাম নেবে না কেন?

বুড়ি বাচ্চা মেয়েদের মতন লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললো, ওটা আমার ঘরের মুরগীর ডিম গো! এই প্রথম ডিম দিল তো। ওটা আমি তোমার জন্যই মনে করে এনিছি।

হঠাৎ আমার সর্বাঙ্গে একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের অনুভূতি হলো। এ যেন আমার দিদিমার সেই ইলিশ মাছের ডিমভাজা কিংবা লক্ষ্মীপুজোর নারকোল নাড়ু!

অনেক দূরের গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক ডজন ডিম যে বিক্রি করতে আসে অতি সামান্য লাভের জন্য সে কেন একটা ডিম আমাকে বিনা পয়সায় দেবে? এসব ব্যাপারে যুক্তি খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

পাশের মেয়েটিও কথাটা শুনতে পেয়েছে। সে অনেকখানি ভুরু তুলে বললো, ওমা, দিদিমা আমাদের কোনোদিন ডিম খাওয়ায় না। আর নাতিকে খাওয়াচ্ছে?

বুড়ি তাকে তাড়না করে বললো, তুই থাম তো!

স্নেহ নিম্নগামী। বুড়িকে আমি ঐ ডিমের বদলে কী দিতে পারি! কিছুই দেওয়া যায় না। বুড়ির অনুরোধে আমি সেই ডিমটিকে আলাদা ভাবে পকেটে ভরে নিয়ে এলুম। একটা ডিমের সঙ্গে আর একটা ডিমের তফাৎ কী বোঝা সম্ভব? বুড়ি কী করে এই ডিমটিকে আলাদা করে রেখেছিল সারাক্ষণ?

এরকম একটা ডিম কি টপ করে খেয়ে ফেলা যায়? এ তো বাঁধিয়ে রাখার মতন জিনিস। বাড়িতে গিয়েই বা কী করে বলি যে এই ডিমটা আমার জন্য আলাদাভাবে রান্না করে দিতে, যাতে অন্য ডিমের সঙ্গে মিশে না যায়।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই চম্পকের সঙ্গে দেখা। যতবার চম্পকের সঙ্গে দেখা হয়, ততবারই সে প্রথম বাক্যটি বলে, শোন্ তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে! পৃথিবীতে ওর সব কিছুই জরুরি।

চম্পকের গায়ের রং খুব ফর্সা, সেজন্য ওর বেশ লজ্জা আছে। ফর্সা মুখখানি ঢাকবার জন্য ও একগাদা দাড়ি গোঁপ রেখেছে। সেইজন্য অনেকে ওকে মিনি কার্ল মার্কস বলে ডাকে।

চম্পকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি আমার পাঞ্জাবির পকেটের ডিমটার কথা ভুলেই গেলুম।

চম্পকের জরুরি বিষয় হচ্ছে, ও একটা চাকরির ইন্টারভিউ পেয়েছে হলদিয়াতে, সেখানে আমি ওর সঙ্গে যেতে রাজি আছি কিনা। আমি এ প্রস্তাবে আপত্তির কিছু দেখলুম না। চম্পক হয়তো চাকরি পাবে না, তাতেও আমার তো ক্ষতি কিছু নেই, আমার বেড়ানো হয়ে যাবে।

বাড়িতে এসে চম্পকের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা চললো ঘন্টাখানেক। তারপর আমি টের পেলুম আমার পাঞ্জাবির ডান পকেটটা ভিজে ভিজে লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে গিয়ে খাবার টেবিল থেকে এক চিমটি নুন নিয়ে ঢুকে গেলুম

বাথরুমে। ভাঙা ডিমটার যতটুকু উদ্ধার করা গেল, তার মধ্যেই নুন ছড়িয়ে সুরুৎ করে দিলুম এক টান।

এ বিষয়ে আমার কোনো গ্লানি হলো না। সব ডিমই এক। একজন ভালোবেসে একটা নিজের বাড়ির মুরগীর ডিম দিয়েছে বলে সেটাতেই যে একেবারে অমৃতের স্বাদ পাওয়া যাবে তার কোনো মানে নেই।

এরপর তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টি চললো।

একজন কারুর সঙ্গে খানিকটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক হলেই তার সুখ-দুঃখের ব্যাপারটা টের পাওয়া যায়। অতি বৃষ্টির ফলে মালদা, বাঁকুড়া, বর্ধমানে বন্যার খবর পড়ছি কাগজে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জল জমে কী দুর্দশা হচ্ছে তাও অনেকটা জানি। কিন্তু বাজারের পাশের রাস্তায় সামান্য সবজি-তরকারি বা ডিম নিয়ে যারা বসে, তাদের কী অবস্থা হয়, তা আগে কোনোদিন চিন্তা করিনি।

অবিরাম বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি কোনো প্রিয়ার ছায়া দেখতে পাই না, আমার একটি সত্তর বছরের বুড়ির মুখ মনে পড়ে, সে মুখটি কখনো আমার দিদিমার, কখনো ডিমওয়ালীর।

এই বৃষ্টির মধ্যে বাড়িতে রোজই খিচুড়ি আর আলু পেঁয়াজ ভাজা চলছে। বাজারে যাবার দরকার নেই। তবু আমি তৃতীয় দিনে নিজের গরজেই একহাঁটু জল ভেঙ্গে ভেঙ্গে বাজারে গেলুম।

পেছনের সেই গলিটি এখন রীতিমতন খাল। রিক্সাওয়ালাদের কোমর ডুবে যায়। সেখানে আনাজ-তরকারির কোনো দোকান থাকারই প্রশ্ন ওঠে না। বাজারের মধ্যেও তিলার্ধ জায়গা নেই, বাইরের খুচরা বিক্রেতাদের সেখানে ঢোকারও অধিকার নেই বোধহয়। ডিমওয়ালীকে আমি কোথাও দেখতে পেলুম না।

আমার মনটা একটু একটু খারাপ হয়ে গেল। ঐ যারা রাস্তার ধারে সওদা নিয়ে বসে, এই তিন দিন তাদের রোজগার বন্ধ। অনিচ্ছামূলক হরতাল। প্রকৃতি আসলে গরিব মানুষদের ওপর কখনো সদয় হয় না।

আশ্চর্য, মাত্র কিছুদিন আগেও আমি খবরের কাগজের পাঠক হিসেবে ফুটপাথের হকার, জবরদখল দোকান, বাজারের বাইরের রাস্তায় আনাজপত্তরের ব্যাপারীদের সম্পর্কে খুব বিরূপ ধারণা পোষণ করতুমক। ভাবতুম, ওরা কলকাতা শহরটাকে আরও কুশ্রী করে তুলেছে, রাস্তা ঘাটগুলো হয়ে উঠেছে হাঁটার অযোগ্য।

আর আজ আমার মনে হচ্ছে, এই তিন দিন রোজগার বন্ধ, ওরা খাবে কী? কয়েকদিন পরে সেই বুড়ির সঙ্গে যখন আমার আবার দেখা হলো, মনে হলো সে যেন আর একটু রোগা হয়ে গেছে। মুখটা শুকনো। কিন্তু ঠোঁটের হাসিটি আগের মতনই মিষ্টি।

জিজ্ঞেস করলুম, বৃষ্টির মধ্যে এই কটা দিন কী করলে? বেচা-কেনা কিছুই হয়নি তো?

বুড়ি বললো, যা বৃষ্টি বাবা, কী করে আসবো! তুমি এয়েছিলে? তোমাদের বাড়িতে জল ঢোকেনি তো? শুনলুম কলকাতার কতক কতক বাড়ি ডুবে গেলো!

পাশের পৌঢ় দোকানদারটি কৌতুক করে বললো, এ বছর আকাশ যেন সর্বক্ষণ নাইছে!

অন্য পাশের হিলহিলে চেহারার কিশোরীটি বললো, আমাদের গাঁয়ের পুকুর থেকে কইমাছ উঠেছিল ড্যাঙায়, আমি একটা ধরিচি।

তিন চার দিন যে ওদের রোজগারপাতি বন্ধ ছিল তা নিয়ে কোনো নালিশ নেই। কোনো তিক্ততা নেই। এ দেশে যাদের একবেলা আহার জোটে না, তারাও কখনো কখনো হাসে।

এক সহানুভূতিশীল সাহেবের লেখায় পড়েছি যে দারিদ্র, মৃত্যু, অনাহার সর্ম্পকে ভারতীয় দর্শন এমন এক জমাট উদাসীনতা সৃষ্টি করে রেখেছে যে সেই আবরণ সরিয়ে ফেলা খুবই শক্ত। নিয়তিবাদ এত প্রবল বলেই কেউ কিছুর প্রতিবাদ করে না। বাইরে থেকে আমদানী করা কোনো পরিবর্তনের আদর্শই এখানে সেইজন্য তেমন কল্কে পায় না।

বুড়ি আমাকে সেদিনের ডিমটার কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। আমি নিজে থেকেই বললুম, ওগো, তুমি যে আমায় ডিমটা দিয়েছিলে সেটার স্বাদ অপূর্ব!

বুড়ি লজ্জা পেয়ে এমনভাবে মাথা দোলাতে লাগলো যেন এ কথা আলোচনার যোগ্যই নয়। তারপর সে বললো, ও বাবা, তুমি একটু সরে দাঁড়াও, ওখানে কাদা রয়েছে, তোমার পেন্টুলে লেগে যাবে।

বুড়ির ঝুড়িতে আজ ন'টি ডিম আছে। গুণে দেখে আমি বললুম, ঐ সবকটাই আমাকে দিয়ে দাও। বাড়িতে আজ বেশি লোক।

বুড়ি দুটি ডিম সরিয়ে রেখে বললো, তুমি সাতটা নাও!

— কেন, ও দুটো দেবে না কেন?

— ও দুটো বড্ড ছোট যে! ওর আমি অন্য খদ্দের পেয়ে যাবো! আমি হেসে ফেলে বললুম, ডিম বড়–ছোট হলে কিছু আসে যায় না। সব ডিমেরই গুণ সমান।

বুড়ি সে কথা বুঝবে না। সে মাথা নাড়তে লাগলো। বড় মাছের টুকরো আর ছোট মাছের টুকরোয় যা তফাৎ, বড় ডিম আর ছোট ডিমেও সেই একই তফাৎ, এই তার ধারণা, মনে হলো।

আমি বললুম, অন্য খদ্দেরকে দেবে কেন, আমাকেই দাও না।

বুড়ি বললো, তুমি এই সাতটা নাও, আর বাকি যা লাগে অন্য দোকান থেকে কিনে নাও।

বুড়ি আমাকে নটা ডিম দেবে না, আমি তা নেবোই। কিছুক্ষণ এইরকম ঝুলোঝুলির পর বুড়ি হার মানলো।

ডিম ক'টি সব আমার থলেতে তুলে দিয় বুড়ি উঠে দাঁড়ালো। কোমরে হাত দিয়ে একটু বিষণ্ন গলায় বললো, শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বাবা! রোজার মাস, রোজ উপোস করতে হয়েতো, আর দুটো দিন বাকি।

আমার আরেকবার চমক লাগলো। এই বুড়ি মুসলমান। আমার দিদিমা ছিলেন নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী। সকাল–সন্ধে এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে জপ করতেন। আমার ভালো করে জ্ঞান হবার পর থেকে দিদিমাকে আমি বিধবা অবস্থায় দেখেছি। বরাবর স্বপাক খেতেন। দিদিমার হাতের রান্না নিরামিষ সুক্তোটি অতি উপাদেয় ছিল।

এই বুড়িও নিষ্ঠাবতী। এতখানি বয়েসেও রোজার মাসে সে সারাদিন উপোস পালন করে। সেই অভুক্ত অবস্থায় ডিম বেচতে আসে। ওর বাড়ির পাশে দারিদ্র্য

নামের দৈত্যটি একটি করাল খড়্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সংসার একটু টাল-মাটাল হলেই কোপ লাগাবে।

মাথার আঁচল টেনে বুড়ি জিজ্ঞেস করলো, বাবা, তুমি আবার কবে আসবে?

।।তিন ।।

ঈদের দিন রফিকদের বাড়িতে আমার প্রত্যেক বছর নেমন্তন থাকে। ঈদের নেমন্তনের বৈশিষ্ট্য হলো, এর জন্য কার্ড ছাপানো হয় না, বাড়িতে এসে মুখে নেমন্তনও করে যায় না। নিজে থেকেই ঈদ মুবারক জানাতে যেতে হয়। হিন্দুদের বিজয়া দশমীর মতন।

রফিক আমার ইস্কুলের বন্ধু। পাছে আমি ঈদের দিনটা ভুলে যাই, তাই রফিক আগের দিন টেলিফোন করে মনে করিয়ে দেয়, কাল আসছিস তো?

হিন্দুরা অনেকেই মুসলমানদের পরবের দিনগুলো ঠিক খেয়াল করে না। ক্যালেণ্ডারে বা খবরের কাগজে হিন্দুদের পুজো-পার্বণের দিনগুলিই প্রাধান্য পায় এ দেশে। আমার অবশ্য ভুলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। রফিকদের বাড়ির খাওয়া-দাওয়া একেবারে বিশ্ববিখ্যাত বলা যায়। ওরকম বিরিয়ানি আমি আর কোথাও খাইনি। অত বড় বড় মাংসের খণ্ড আর অত খাঁটি ঘি যে ওরা কোথায় পায় কে জানে? আর বিরিয়ানির সঙ্গে ওরা টক টক ঝাল ঝাল একটা পানীয় দেয়। যার নাম বুরহানি, সেটা একবারে অপূর্ব! সেটাই তো আমি দশ বারো গেলাশ মেরে দিই!

রফিকরা বেশ ধনী, রীতিমতন খানদান আছে। এক সময়ে ওদের মুর্শিদাবাদে জমিদারি ছিল, এখনও জমিজমা কম নয়। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গে ওদের ছিল দু'খানা চা-বাগান। কলকাতায় পার্ক সার্কাস, বেকবাগান অঞ্চলে খান চারেক বাড়ি। রফিকের মা উনপঞ্চাশটি কুকুর পোষেন। সেই কুকুরের জন্যই মাসিক খরচ পাঁচ হাজার টাকা। টাকার অঙ্কটা আমি আন্দাজে বললুম, এর অনেক বেশিও হতে পারে।

রফিককে আমি ঈর্ষা করি।

আমার গায়ের রং ঠিক ছাতার মতন নয়, তার চেয়ে একটু পরিষ্কার, চেহারাটা লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা। রফিক গৌর বর্ণ, অ্যাথলীটদের মতন স্বাস্থ্য। সে জন্য নয়।

রফিকদের বাড়িতে তিনখানা গাড়ি আর টাকাকড়ির অভাববোধ কাকে বলে তা ওরা জানে না। আর আমরা খুব গরিব না হলেও টানাটানির সংসার, মাসের শেষে কাটা পোনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বড় জোর কুচো চিংড়ি বা পমফ্রেট, তেলাপিয়া। সে জন্যও নয়।

রফিক ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র, আমি ঠিক ফেল-করা না হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে পাশ করার দলে। সে জন্যও নয়।

আমি রফিককে ঈর্ষা করি, তার কারণ রফিকের ইচ্ছে এবং অনিচ্ছের প্রবল মূল্য আছে।

উদাহরণ দিচ্ছি!

রফিক কোনোদিন ভোর পাঁচটায় ওঠে, কোনোদিন বেলা এগারোটায়। এক

একদিনরফিক সারাদিন বাড়ি থেকে বেরোয় না, আবার কখনো কখনো রফিক আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে লাগাতার আড্ডা মারে।

রফিক এমনিতে খুব পড়ুয়া ছেলে। বই সম্পর্কে বাছ–বিচার নেই। উইপোকার মতন যে কোনো বই পেলেই এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়। এত বই পাওয়া যাবে কোথায়? রফিক আর আমি দু'জনেই ন্যাশনাল লাইব্রেরির মেম্বার, কিন্তু রফিক একবার ওর ন্যাশনাল লাইব্রেরীর দু'খানা বই হারিয়ে ফেললো। তারপর আর অনেকদিন যায় না, কিন্তু সে জন্য আফশোস করে। আমি ওকে অনেকবার বলেছি, চল আমার সঙ্গে, ওখানকার একজন অ্যাসিস্টান্ট লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গে আমার চেনা আছে, একটা কিছু সহজ ব্যবস্থা হয়ে যাবে। রফিকের তো বইয়ের দাম দিতে আপত্তি নেই, কিন্তু কারুর সামনে দাঁড়িয়ে যে বই হারানোর কথা বলতে হবে, ওটাতেই ওর লজ্জা।

একদিন রফিক আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলো। সনির্বন্ধ অনুরোধ। আমি যেন রফিকের বাড়িতে সকাল দশটার সময় যাই। তারপর ওদের গাড়িতে যাওয়া যাবে ন্যাশনাল লাইব্রেরি। আমি যথারীতি দশটার সময় গিয়ে শুনি রফিক তখনও ঘুমোচ্ছে। সারা কলকাতা তখন ব্যতিব্যস্ত, ট্যামে–বাসে বাদুড় ঝোলা ভিড়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে সবাই যখন জীবিকার সন্ধানে আধা উন্মত্ত, তখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে রফিক।

উঠলো পৌনে এগারোটার সময়। মুখ চোখ না ধুয়েই বসবার ঘরে এসে আমাকে বললো, নীলু তুই এসে গেছিস? ফাইন! একটু বোস, আমরা একসঙ্গে নাস্তা খাবো। আজ আর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাওয়া হবে না।

— কেন যাবি না কেন?

— ইচ্ছা করছে না!

এই যে রফিক বললো, ইচ্ছা করছে না, এটাই ফাইনাল। কোনো মতেই আর ওর মত বদল করা যাবে না। রফিকের দ্বিধাহীন পরিচ্ছন্ন মুখ, পরিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। ওর ইচ্ছা করছে না, এটাই এখন সবচেয়ে বড় যুক্তি।

আবার এই রফিকই রাত বারোটায় আমার বাড়িতে এসে বলে, নীলু, চটপট তৈরি হয়ে নে। আমরা জামসেদপুরে যচ্ছি।

আমাকে অবাক হবারও সুযোগ দেয় না। আমার হ্যাঁ কিংবা না শোনার আগেই ও বলে, কোনো অসুবিধা তো নেই। গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, ভোরের মধ্যেই পৌঁছে যাবো। দেখিস, ছ'টার আগেই– ।

যেন জামসেদপুরে পৌঁছোতে সাতটা বেজে গেলেই আমার আপত্তি, ছ'টার মধ্যে পৌঁছোলে তো কোনো কথাই নেই।

— কেন, জামসেদপুরে যাবো কেন?

— ইচ্ছা করছে।

— হঠাৎ এ রকম ইচ্ছে হলো কেন?

— কাল দশটায় ওখানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলা আছে। দেখে আসি চল।

–আর পাঁচ দিন বাদেই তো ওয়েস্ট ইন্ডিজ কলকাতায় টেস্ট খেলবে। জামসেদপুরে যাবার দরকার কী?

— খুব ইচ্ছা করছে!

সেই পরিচ্ছন্ন মুখ, পরিপূর্ণ চোখের দৃষ্টি। ইচ্ছা করছে যখন তখন যেতে তো হবেই।

শুধু যাওয়া-আসার ব্যাপারেই নয়, রফিকের আড্ডা, তাশ খেলা, বই পড়া, বন্ধুত্ব সব বিষয়েই ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্পষ্ট ভাগকরা আছে।

অথচ আমি কত ইচ্ছে বিসর্জন দিয়েছি ভাগীরথীর জলে। কত অনিচ্ছের দায়িত্বের বোঝা পিঠে নিয়ে ঘুরেছি।

কলেজ জীবনের শেষ দিকে রফিক আর আমি একই মেয়ের প্রেমে পড়ি। তাই নিয়ে আমাদের দু'জনের সম্পর্কে খানিকটা চিড় ধরেছিল, তাও মাত্র কিছু দিনের জন্য। তারপর আমরা উদারতার খেলা খেলতে শুরু করি। রফিক যেন চরম আত্মত্যাগ করে মেয়েটিকে আমার হাতেই তুলে দিতে চেয়ে নিজে একটু একটু করে দূরে সরে যেতে লাগলো। আমিই বা কম উদার হবো কেন? আমি রফিককে বলেছিলুম, রিঙ্কি তোকেই বেশি পছন্দ করে, আমি আমের আঁটি হয়ে মাঝখানে থাকতে চাই না। রফিক এ কথার প্রতিবাদ করলো। আমি আরও জোরে প্রতিবাদ জানালুম।

এর ফলে হলো কী, আমরা দু'জনেই রিঙ্কির থেকে দূরে সরে গিয়ে পরস্পরের কাছাকাছি চলে এলুম আবার। এখন রিঙ্কি আমাদের দু'জনের কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আমি আর রফিক আমাদের সেই সাময়িক দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করি প্রায়ই।

রফিকদের পরিবারে বাল্যবিবাহের চল আছে। এ বাড়ির পুরুষদের কুড়ি একুশ বছরে বিয়ে হয়ে যায়। ওদের যৌথ সংসার, রফিকের অনেক খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো ভাই থাকলেও রফিক তার পিতার একমাত্র পুরুষ-সন্তান। সেই জন্যই রফিকের বিয়ের জন্য অনেক দিন থেকেই চাপ দেওয়া হচ্ছে। রফিকের আব্বা অতি শান্ত প্রকৃতির মহিলা। তিনি তাঁর পোষ্য কুকুরদের নিয়েই সারাদিনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেন। রফিকের আম্মা অতি জাঁদরেল। এ বাড়িতে তাঁর দোর্দণ্ড প্রতাপ। তিনি রফিকের শাদীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু রফিকের এক উত্তর, ইচ্ছা করছে না! ব্যস, এর ওপর আর কথা নেই। সাতাশ বছর বয়েস, এ পর্যন্ত রফিক তার অনিচ্ছা বজায় রেখেছে।

রফিকের মন দুর্বল করার জন্য ওর আম্মা প্রায়ই দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের সুন্দরী মেয়েদের নেমন্তন্ন করেন এ বাড়িতে। ঈদের দিনেও তাদের দেখা যায়। ঈদের দিনে এ বাড়িতে আসার জন্য সেটাও আমার একটা অতিরিক্ত আকর্ষণ। কিংবা খাদ্যটা গৌণ। এটাই প্রধান।

বনেদী বাড়ির প্রথা অনুযায়ী বাইরের লোকদের পক্ষে এ বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে সহজ মেলামেশার সুযোগ নেই। কিন্তু পর্দা প্রথাও চালু নেই। আমরা রফিকের বন্ধুরা এসে বসি তেতলায় রফিকের নিজস্ব ঘরে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে কোনো কোনো যুবতীকে দেখতে পাই। এক একজনকে দেখলে যেন গলার কাছে দম বন্ধ হয়ে আসে। এই সব সাংবাত্তিক সুন্দরীরা বছরের অন্য সময় কোথায় থাকে? আর কোনো সময়ে তো দেখতে পাই না। এই সব সুন্দরীদের দেখেও রফিকের মতিভ্রম হয় না?

গত বছর এই দিনে আমি রফিকের ফুফার মেয়ে সম্পর্কে একটু বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে ফেলেছিলুম। মেয়েটির নাম সেলিনা, ডাকনাম রোমি। ঐ নামেই ওকে

অনেকে ডাকছিল। ওর বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়, বেশ লম্বা শীরের গড়নাট ছবি–ছবি মতন। এ বাড়িতে অনেক মহিলারই দুধে–আলতা রং। সেই তুলনায় রোমির রং একটু চাপা। সবাই রোমিকে সুন্দরী বলবে, কিন্তু ওর চোখ দুটির যেন তুলনাই হয় না। এত বড় বড় চোখের পল্লব যে কোনো মেয়ের হয় তা আমি না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। ওর চোখের পল্লব যেন কোনো ফুলের সূক্ষ্ম পাপড়ি। অবশ্য কালো রঙের ফুল আমি কখনো দেখিনি।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমি রোমির মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলুম। সাদা সিল্কের শাড়ি পরা। শরীরে কোনো অলঙ্কার ছিল কি না লক্ষ করিনি। রোমি অকারণ লজ্জাবতী লতা নয়, আমাকে দেখেই সে শরীর কুঁকড়ে মুখ ফিরিয়ে নিল না। স্পষ্ট ভাবে চেয়ে রইলো। সে দৃষ্টিতে কি খানিকটা কৌতুক চাঞ্চল্য ছিল!

কয়েক মুহূর্ত মাত্র, আমিও থমকে দাঁড়াইনি, রোমিও গতিবেগ সংযত করেনি, সে নেমে গেল,আমি উঠে এলুম। বুকটা একবার কেঁপে উঠেছিল ঠিকই।

ওপরে এসে আমি রফিককে জিজ্ঞেস করেছিলুম, রোমি কি বাঙালী? কলকাতায় থাকে? ওকে দেখলে মনে হয় হিমালয়ের কাছাকাছি কোথাও থাকে।

রফিক হেসে উঠে বলেছিল, তুই কি রোমির প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি? তা হলে বেশ মজা হবে!

মজা? এই প্রসঙ্গে কি মজা কথাটা খাটে? রফিকের এই হাল্কামি আমার পছন্দ হয়নি।

রফিক বলেছিল, কেন বলছি জানিস? রোমি একটু পাগলাটে ধরনের মেয়ে, ঝুঁকি নিতে খুব ভালোবাসে। বছর চারেক আগে, খুব বুড়ো আর মোটামুটিভাবে গরীব এক সেতারের ওস্তাদজীকে ও বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিল। তারপর আর একবার ট্রেনে বম্বে যাবার সময় রোমি টপ করে নেমে পড়েছিল জলগাঁও স্টেশনে। রাত তখন তিনটে। পরের স্টেশনে গিয়ে রোমির খোঁজ পড়ল, তারপর সে কি কাণ্ড! হা–হা–হা–হা! খুব মজা হয়েছিল!

আমি এক দৃষ্টে চেয়েছিলাম রফিকের দিকে। আরও কিছু শুনতে চাইছলাম।

–তুই যদি ওকে প্রেম নিবেদন করিস–আমি বাড়ির ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, প্রথমে চিঠি লিখবি, তারপর দেখা করবি–তুই তো একটা লক্ষ্মীছাড়া বাউণ্ডুলে, তোকে রোমির পছন্দ হয়ে যাবে, টপ করে বিয়ে করে ফেলবি, তারপর দু'জনেই দারুণ বিপদে পড়ে নাস্তানাবুদ হবি, বেশ মজা হবে! হা–হা–হা!

মেজাজ ভালো থাকলে রফিক দম ফাটিয়ে হাসতে পারে যখন–তখন। ওর হাসির ধাক্কায় মনে হয় যেন দরজা–জানলা কাঁপে।

সিঁড়িতে এক রমণীর সঙ্গে একবার মাত্র দেখা হবার পরেই তার সঙ্গে প্রেম, বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ে, তারপর দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারস্যাপার... এতখানি ভেবে ফেলার মতন পরিকল্পনাবাজ আমি নই।

পাহাড়ের কোলের কাছে মারুমাঢ় নামে এক অপরূপ ঢাক বাংলোয় গিয়েছিলুম, তখন বিকেল প্রায় শেষ, আলো নরম হয়ে এসেছিল, চতুর্দিকে জঙ্গল, সেদিকে প্রায় ঋষিহীন তপোবন বলা যায়, দুটি হরিণ উঁকি দিয়ে আমাদের দেখে আবার উধাও হয়ে গেল। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলুম, তাঁদের হাতে একটুও সময় ছিল না। সেই

বাংলোতে আসা হয়েছিল শুধু একজনের জরুরি বাথরুম ব্যবহারের জন্য। এমন একটা চমৎকার বাংলো শুধু ঐটুকু সময়ে কি উপভোগ করা যায়? জিপ গাড়িতে ওঠার পর আমি আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সেই বাংলোটির দিকে মনে মনে বলছিলুম, আবার আসতে হবে, আবার দেখা হবে।

রোমি সম্পর্কেও তাই। ওকে শুধু আমি আর একবার দেখতে চেয়েছিলুম। সৌন্দর্যতৃষ্ণা, আর কিছু নয়।

রফিক বলেছিল, তুই আনোয়ারুল চৌধুরীকে চিনিস? আমার এক দুলাভাইয়ের ছোট ভাই। ডাক্তার, তুই দেখেছিস, এ বাড়িতে একসময় প্রায়ই আসতো, একটা চোখ একটু ট্যারা মতন।

আমার মনে পড়লো, আমি ডাক্তার আনোয়ারুল চৌধুরীকে দেখেছি। একটু আলাপও হয়েছিল।

—উনি কাকে বিয়ে করেছেন জানিস? কলেজে আমাদের হিস্ট্রি পড়াতেন মনো-মোহন চক্রবর্তী? তাঁর মেয়েকে। প্রেমের ব্যাপার। মনোমোহন চক্রবর্তী গোঁড়া বামুন, এ বিয়ে অ্যাকসেপ্ট করেননি। মেয়ে-জামাইকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না। ওদিকে আনোয়ারুল সাহেবের বাবাও প্রায় এক মোল্লা, তিনিও চটে লাল। ভেবেছিলেন ছেলে ডাক্তার, বেশ ভালো পাত্র, একটা বেশ পয়সাওয়ালা বাড়ির মেয়েকে বউ করে আনবেন। সেটা ফস্কে গেল। গরিব মাস্টারের মেয়ে, তাও আবার হিন্দু। ব্যস, সে বাড়িতেও ঢোকা বন্ধ। ওরা বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল টালিগঞ্জে। যেই জানাজানি হয়ে গেল যে মুসলমানের ছেলে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করে এনেছে, অমনি বাড়িওয়ালা নোটিশ দিল। এখন আর কোথাও বাড়ি পায় না। খুব গণ্ডোগোলে পড়েছে, দারুণ মজা চলছে। হা-হা-হা!

রফিকের মজা বোধটা সত্যিই অদ্ভুত!

গত বছর সেই রোমিকে দেখার পর মাস খানেক বাদে রফিক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী রে, তোকে যে সেগিনার ঠিকানা দিয়েছিলুম, তুই চিঠি লিখেছিস? দেখা করেছিলি?

আমি মাথা নেড়েছিলুম দু'দিকে।

—কেন রে, আনোয়ারুল সাহেবের কেসটা শুনে তুই ঘাবড়ে গেলি নাকি?

—যার সঙ্গে আলাপ হয়নি, তাকে চিঠি লেখা যায়? ওদের বাড়িতেই বা হুট করে যাবো কী করে?

—তোকে চেনে! আমি তোর কথা রোমিকে বলেছি।

—অ্যাঁ? কী বলেছিস?

—রোমিকে বলেছি যে তোর একটি নীরব প্রেমিক আছে, দূর থেকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোর ঘরের জানলা খুললে হয়তো দেখতে পাবি ল্যাম্পপোস্টে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বলতে বলতে রফিক অট্টহাসি হেসে উঠেছিল। আমি মনে মনে বলেছিলুম, ঠিক আছে, তোমারও পাওনা রইলো। আমারও সুযোগ আসবে।

তারপর আমি রোমিকে মুছে ফেললুম মন থেকে।

এ বছরেও একটি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো। রফিকের বাড়িতে এসে ওর জ্যাঠতুতো

দাদা জাভেদ-এর সঙ্গে দেখা হলো। একতলায়। আরও লোকজন রয়েছে অনেক। কিন্তু রফিক সেখানে নেই। সাধারণত অতিথিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য রফিক নিচেই থাকে।

জাভেদ আমাকে বললো, তিনতলায় চলে যাও। রফিক ঘরেই আছে। এখনো নিচে নামেনি।

আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, আড়াইতলায় কাছাকাছি আসতেই ওপর থেকে নেমে এলো একজন। সাদা সিল্কের শাড়ি পরা, এক দীর্ঘদীপিতা। রোমি! গত বছর ঠিক এই একই সময়ে, খুব সম্ভবত আড়াইতলায় ঠিক এই সিঁড়িটাতে দাঁড়িয়েই আমি রোমিকে দেখেছিলাম। সেদিনও এই রকম সাদা সিল্কের শাড়ি পরে ছিল। আমার মুখের দিকে কৌতুক-চঞ্চল চোখে তাকালো। যেন টাইম মেশিনে আমরা দু'জনেই এক বছর পেরিয়ে গেছি।

এবার বোধহয় দু'একটা মুহূর্ত বেশি থেমে রইলাম। এবারে লক্ষ করলুম ওর গলায় একটা সবুজ পাথরের মালা, মাথার চুল খোলা। রোমি চোখ সরালো না, আমি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে উঠে এলুম ওপরে।

বুক টিপটিপ করছে, গত বছরের চেয়েও জোরে টিপ টিপ করছে। তাতেই বুঝতে পারলুম, যা দেখলুম, তা সন্ধেবেলার স্বপ্ন নয়।

রফিকের ঘরে এসে দেখি জানলার দিকে মুখ করে সে একটা গদি- মোড়া, হাতলওয়ালা পুরোনো আমলের চেয়ারে বসে আছে পরনে সোনালি কাজ করা একটা মেরুন রঙের কুর্তা আর পাজামা। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

এই রকম পোবাকে রফিককে খুব সুন্দর মানায়। কিন্তু সে যখন মুখ ফেরালো তখন তা বিমর্ষ মনে হলো। এই উৎসবের দিনে সে এ রকম একা বসে আছে?

—ঈদ মুবারক, রফিক!

ও খুব আস্তে বললো, মুবারক। তারপর মুখটা আবার ফিরিয়ে নিল জানলার দিকে।

—কী রে, আর কেউ আসেনি?

—না।

—তুই ঘরে একা একা বসে আছিস? নিচে যাসনি?

—না।

—কেন?

—ইচ্ছা করছে না!

আমি আর কথা না বাড়িয়ে ওর বইয়ের আলমারির কাছে দাঁড়ালুম। রফিকের ঘরটা বিচিত্রভাবে সাজানো। পুরনো আমলের বাড়ি, বেশ বড় ঘর। চারখানা জানলা। একদিকের দেয়ালে রয়েছে একটি চিতাবাঘের মুণ্ডু ট্যাক্সিডার্মি করা। ওদের জলপাইগুড়ির চা বাগানে ওদেরই বংশের কেউ বাঘটি মেরেছিলেন। খুব বেশি দিন আগে নয়।

রফিক নিজে বন্দুক-পিস্তল ছোঁয় না। আসলে ওকে মানাতো একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে, কোমরে তলোয়ার, দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায়। ওর মেজাজ-মর্জিই অন্তত তিনটে শতাব্দী আগেকার কোনো সম্রাটপুত্রের মতন।

অন্য দিকের দেয়ালে একটি বিশাল ছবি। মদিগ্লিয়ানির আঁকা এক শায়িতা সুন্দরীর প্রিন্ট!

এ ছাড়া এলোমেলো ভাবে ছড়ানো অজস্র বই। রফিক এক সঙ্গে তিন চারখানা বই পড়তে শুরু করে। সেগুলো সব ওল্টানো থাকে এদিকওদিক। সেই সব বইতে কেউ হাত দিলে রফিক চটে যায়। কিন্তু ওর ঘরের অন্য বই, যা ওর পড়া হয়ে গেছে, সেগুলো চাইলে ও অনায়াসে দিয়ে দেবে, কোনোদিন ফেরৎ চাইবে না।

রফিক এখন গম্ভীর, ওর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, শুধু হ্যাঁ, না উত্তর দেবে। অন্য বন্ধুরা কেউ আসে নি কেন এখনো? আমি তো সকাল থেকেই ছটফট করছিলুম। রোমিকে দেখার সুপ্ত বাসনাই কি আমাকে এত তাড়াতাড়ি টেনে এনেছে? মন অনেক কিছু চায়, যা মনই জানে না।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে রফিক বললো, নীলু, আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। তুই আমাকে একটা ফ্ল্যাট খুঁজে দিতে পারবি?

আমি ওর দিকে চুপ করে চেয়ে রইলুম। ও আরও কিছু বলুক। একটা চমকপ্রদ খবর শোনালেই যে আমাকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে হবে, তার কোনো মানে নেই।

— তোর তো অনেক চেনা, দ্যাখ না খোঁজ করে, দু'কামরার একটা ছোট ফ্ল্যাট হলেই চলবে, মোটামুটি ভালো পাড়ায়, যোধপুর পার্ক বা সল্ট লেখক হলেই ভালো– দেখবি একটা?

— না।

— তুই আমার জন্য ফ্ল্যাট খুজবিনা কেন?

–আমি কোথায় ফ্ল্যাট খুঁজবো? বাড়ি পাওয়া এখন খুবই শক্ত শুনেছি... তারপর আমি যদিও বা কষ্ট করে কোনো ফ্ল্যাট খুঁজে বার করি, তারপর তুই বলবি, নাঃ যাবো না, ইচ্ছা করছে না!

যেন আমার জন্যই রফিক কষ্ট করে একটুখানি হাসলো। তারপর বললো, না রে, এবাড়িতে আমি আর থাকবো না ঠিক করেছি। ফ্ল্যাট না পেলে হোটেলে চলে যাবো!

— ঈদের দিনে এসব কী কথাবার্তা? কার সঙ্গে ঝগড়া হলো!

— তুই বুঝতে পারবি না, নীলু, তোর তো অন্যরকম জীবন! আমাদের এই এত বড় বাড়ি, এতরকমের লোক, যারই আমার থেকে একটু বয়েস বেশি, সে-ই আমার ওপর একটা মতামত চাপিয়ে দিতে চায়! আমাদের দেশে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার, বয়েস বেশি হলেই যেন দাদাগিরি ফলাবার অটোমেটিক অধিকার এসে যায়! তোর তো ওপরে দাদা-টাদা কেউ নেই!

— তোরও তো আপন বড় ভাই কেউ নেই!

— তাতেও কোনো সুবিধে নেই। মাসি-পিসি, কাকা-টাকারাও দাদাগিরি ফলাতে আসে। অধিকারটা লিগ্যাল নয়, মরাল। কিন্তু আমার জীবনটা হচ্ছে আমারই জীবন। আমি কেন অন্যের কথা অনুযায়ী চলবো?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলুম, ভাই রফিক, আমাকে তো বাধ্য হয়েই অন্য অনেকের মতামত মেনে নিতে হয় অনেক সময়। এমনকি আমাদের বাড়িওয়ালা পর্যন্ত দমক দিয়ে বলে, রাত এগারোটার মধ্যে না ফিরলে সদর দরজায় তালা পড়ে

যাবে। কিন্তু তোর কথা আলাদা। তোর ওপর আবার কে মতামত চাপিয়ে দেবার সাহস পাবে? বিয়ের জন্য বাড়িতে আবার খুব পেড়াপেড়ি করছে বুঝি?

— আরে আজ আমার বড় ভাই ঠারে ঠোরে শাসিয়ে গেল যে আমি যদি শিগ্‌গির বিয়ে না করি তাহলে আমি নানীর সম্পত্তির ভাগ পাবো না। ওদের ভয়, আমি ফট্‌ করে একটা হিন্দু মেয়েকে না বিয়ে করে ফেলি!

— সেরকম কোনো মেয়ের সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে নাকি?

— আমার এক এক সময় ইচ্ছে করে কি জানিস? একটা ইহুদী মেয়েকে বিয়ে করে এনে এদের সবাইয়ের একেবারে পিলে চমকে দিই। হিন্দু মেয়ে যদি বা সহ্য করতে পারে, ইহুদী মেয়ে দেখলে সবাই তিড়িং তিড়িং করে লাফাবে!

— ওরে বাবা, তোর যখন ইচ্ছে হয়েছে, তা হলে তো তুই সত্যি ইহুদী মেয়েই বিয়ে করে ফেলতে পারিস! অবশ্য, কলকাতায় বসে সে রকম ইহুদী মেয়ে টপ্‌ করে পাওয়া যাবে না!

— আমাকে বিষয় সম্পত্তির ভয় দেখাচ্ছে! যেন আমি পরোয়া করি!

— এই একটা ব্যাপারে, রফিক, তোর চেয়ে আমি অনেক বেশি ভাগ্যবান। সর্বহারার কোনো কিছুই হারাবার ভয় থাকে না। আমার চোদ্দ পুরুষের যাবতীয় বিষয় সবই শূন্য আকাশের সম্পত্তি। সুতরাং তা থেকে আমাকে কেউ বঞ্চিতও করতে পারবে না।

— আই ডোন্ট এন্‌ভি ইউ, নীলু! বাপ–মায়ের কিছু টাকা পয়সা থাকা ভালো, তাতে অনেক সুবিধে হয়। চাকরি–বাকরির মতন বাজে ব্যাপারে কোনোদিন আমার দ্বারা সম্ভব হতো না। টাকার চিন্তা করাটা অনর্থক সময় নষ্ট। এখন থেকে আমি সত্যিই কিছু কাজ করতে চাই। নিজের কাজ।

— কী কাজ?

— আমি লিখবো। সেই জন্যই আমার আলাদা একটা ফ্ল্যাট দরকার। যেখানে আমায় কেউ ডিসটার্ব করবে না। তোর মতন ঘনিষ্ঠ দু' একজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ সেই ঠিকানাই জানবে না।

আমি জোরে হেসে উঠলুম। তাতে ঠিক ব্যঙ্গের সুর ছিল না, খানিকটা প্রশ্রয়ই ছিল, তবু রফিক চটে গেল। তীক্ষ্ণ গলায় বললো, তুই হাসছিস? তোর ধারণা, আমি চেষ্টা করলেও কিছু লিখতে পারবো না?

— সে জন্য হাসিনি রে! রফিক, তোর ফরাসী দেশে জন্মানো উচিত ছিল। সেখানে শুনেছি লেখকরা কোনো নির্জন জায়গায় চলে যায়, তাদের ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় পাহাড় কিংবা সমুদ্র, সেখানে তারা সারাদিনে একপাতা বা আধপাতা লেখে, একখানা বই শেষ করতে লাগে দু'তিন বছর। আমাদের দেশে উঠতি লেখকদের পেটের ধান্দায় ঘুরতে হয়, কেরানিগিরি বা মাস্টারি বা খবরের কাগজের অফিসে খুচরো কোনো চাকরি জুটিয়ে নেয়, সারাদিন সেই খাটুনি। বাড়িতেও নিজস্ব কোনো ঘর নেই, বাচ্চাবাচ্চাদের চ্যাঁচামেচি, সন্ধের পর লোডশেডিং। সকালে বাজারে যেতে হয়, রেশনের দোকানে লাইন দিতে হয়, তারই মধ্যে টুকটাক লেখা চলে। এইভাবেই তো বাংলা গল্প–কবিতা লেখা চলছে।

— কেন, রবিঠাকুর শিলাই দেহে গিয়ে বোটে করে ঘুরতে ঘুরতে লেখেননি!

—তুই রবীন্দ্রনাথের যুগে ফিরে যেতে চাস?

—শোন্, যদি কারুকে আদর্শ করতে হয়, তাহলে সবচেয়ে যিনি বড় তাঁকেই আদর্শ করবো।

—চমৎকার কথা। আমরা তাহলে দ্বিতীয় একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য প্রতীক্ষায় থাকবো।

—ঠাট্টা করছিস তো, দেখিস।

—মোটেই না।

—আমি সেরকম কিছু লিখতে পারবো কি না জানি না। কিন্তু চেষ্টা একবার করবোই যথাসাধ্য। এ বাড়ি ছেড়ে যখন চলে যাবো ঠিক করেছি।

আমি চুপ করে গেলুম। সত্যিই তো, রফিকের সঙ্গে তর্ক করার তো কোনো মানেই হয় না। রফিকের যখন ইচ্ছে হয়েছে, তখন কেউ আর ওকে ফেরাতে পারবে না।

বংশানুক্রমিক বাড়ি ছেড়ে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া যে কী রকম অভিজ্ঞতা, যে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। রফিক একেবারে কষ্ট সহ্য করতে পারে না, ও কি থাকতে পারবে একা একা? হয়তো এটা ওর দু'দিনের খেয়াল।

রফিক বললো, আমি তোর সাহায্য চাই, নীলু। তুই তো সারা কলকাতা টো টো করে ঘুরে বেড়াস। তুই দ্যাখ না, যদি একটা ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিতে পারিস আমার জন্য?

—আমি যদি ফ্ল্যাট জোগাড় করে দিই তাহলে তোর বাড়ির লোকেরা ভাববেন, আমিই তোকে বাড়ি ছাড়ার কু-পরামর্শ দিয়েছি!

—ধ্যাৎ! আমার বাড়ির লোক কী ভাবলো না ভাবলো তাতে তোর কী আসে যায়? শোন, তুই যদি আমার জন্য ভালো একটা জায়গা ঠিক করে দিতে পারিস তাহলে আমি তোকে পুরস্কার দেবো!

—এক মোহর বকশিশ?

—তারচেয়ে অনেক বেশি। আমি রোমিকে আসতে বলবো আমার ফ্ল্যাটে, সেখানে তোর সঙ্গে ওর দেখা হবে!

সবাই বলে আমি সহজে লজ্জা পাই না। কিন্তু রফিকের মুখে এই কথাটা শোনা মাত্র আমার কান গরম হয়ে উঠলো। রোমির সঙ্গে আমি এ পর্যন্ত একটাও কথা বলি নি। আমাকে সে চেনেই না। তার মতন অসাধারণ একজন রূপসী আমার মতন একজন ফেক্‌লুকে পাত্তাই বা দেবে কেন?

শুধু লজ্জা নয়, রোমির নাম শুনে আমার গলার কাছে একটা ব্যথা-ব্যথারও ভাব হলো।

রফিক জিজ্ঞেস করলো, তোর সঙ্গে রোমির দেখা হয়েছে আজ?

আমি দু'দিকে মাথা নাড়লুম। সত্যি কথা বলতে পারলুম না।

—তুই যদি একটু আগে আসতি, তা হলেই দেখা হয়ে যেত। রোমি তো আমার এখানেই ছিল। রোমিরও বেশ প্রবলেম চলছে। ডাকবো ওকে?

আমি প্রবলভাবে বললুম, না, না, না, ডাকতে হবে না।

রফিক তা গ্রাহ্য করলো না। দরজার কাছে গিয়ে হাঁক দিল, কাদের! কাদের!

কাদের নামে একটি ফুটফুটে কিশোর রফিকের ফাইফরমাস খাটে। সে বারান্দা দিয়ে ছুটে আসতেই রফিক বললো, তুই সেলিনা আপাকে চিনিস তো? কাদের অনেকখানি ঘাড় নেড়ে বললো, জী!

—তাকে ডেকে নিয়ে আয়। আমর নাম করে বলবি এক্ষুণি আসতে! আমার খুবই অস্বস্তি লাগছে। রফিকদের বাড়িতে বাইরের লোকদের সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দেবার রীতি নেই আমি জানি। এ বাড়িতে আমি অনেক দিন যাওয়া-আসা করছি। রফিকের আম্মা আমাকে চেনেন। কিন্তু ওর এক ভাবীকে আমি সিঁড়িতে ওঠা-নামার পথে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কোনোদিন একটাও কথা হয় নি।

দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়ে দেখলুম, সিঁড়ির নিচে অনেক লোকজন। ভালো রান্নার মন-মাতানো গন্ধ ভেসে আসছে। বাচ্চারা হৈ-হল্লা করছে একতলায়।

হঠাৎ আমার সেই ডিমওয়ালী বুড়ির কথা মনে পড়লো। তার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পেলুম। রোজার উপোস করে তার শরীরটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আজ তার বাড়িতেও নিশ্চয়ই ঈদের উৎসব। গরিবের বাড়িতে এসব দিনে কেমন উৎসব হয় কে জানে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো চম্পক, কায়সুল আর বরুণ। চম্পক চেঁচিয়ে বললো, কি রে, নীলু, তুই আগেই চলে এসেছিস? আমাদের ডেকেআনার কথা ছিল না?

আমার মনটা দমে গেল। বন্ধুদের দেখলে আমি সব সময়েই খুশী হই, কিন্তু সেলিনা যেন এখন না আসে।

ঠাঠা পোড়া রোদ্দুরের মধ্যে যদি গিয়ে উপস্থিত হই, চৌকিদারটি গোমড়ামুখো, সামনের বাগানে তিনজন লোক বসে ট্রানজিস্টারে বিকট গান শুনছে, এমন অবস্থায় মারুমাড় বাংলো কী আমার ভালো লাগবে আগের মতন? সুন্দরেরও একটা বিশেষ সময় আছে।

এরপর আধগন্টা আড্ডা চললো তুমুল। রোমি এলো না। কাদের এসে খবর দিয়ে গেল সেলিনা আপা খেতে বসেছেন। আমি তাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

তারপর এক সময়ে আমরাও খেতে গেলুম নিচে। রোমিকে দেখা গেল না কোথাও। সেটাই তো স্বাভাবিক।

এত ভালো ভালো খাবার, তবু আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম। কে কী বলছে তাও শুনতে পাচ্ছি না। নরম আলোয় পাহাড়ের উপকণ্ঠে ছবির মতন একটা বাংলো, জঙ্গল থেকে তিনটে চিত্রল হরিণ চলে এসেছে, বাগানে দাঁড়িয়ে আছে রোমি, শাদা সিল্কের শাড়ি পরা, আর কেউ নেই সেখানে। হরিণের অবাক চোখ দিয়ে আমি রোমিকে দেখছি-

রফিক আমার পিঠে চাপড় মেরে বললো, কী রে, নীলু, শুধু শুধু হাড্ডি চিবাচ্ছিস কেন? আর একটু মাংস নে।

বরুণ বললো, নীলু, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমি এই শনিবার পাটনা যাচ্ছি, হোটেলে তো ডাবল রুম থাকবেই, তুই যাবি আমার সঙ্গে!

চম্পক বললো, উঁহু, নীলু যেতে পারবে না, ওকে আমি আগেই বুক করেছি। ও আমার সঙ্গে হলদিয়া যাবে।

কায়সুল বললো, নীলুটা বেশ আছে। আল্লার ষাঁড়। কেউ বাইরে যাবার একটা তাল তুললেই হলো। ও অমনি রাজি!

আমি কোনো কথা বললুম না।

রফিক ডেকে পাঠিয়েছিল, তবু রোমি আসেনি। রফিকের সঙ্গে আমিও আছি জেনেই ইচ্ছে করে আসে নি? কিংবা আরও তিনজন বন্ধু এসে গেছে বলেই!

রফিক বলেছিল, রোমিরও একটা সমস্যা চলছে। কী সেই সমস্যা? একটা অসমাপ্ত কাহিনী জানার কৌতূহল আমার মনের মধ্যে ছটফট করতে থাকে।

।। চার ।।

চম্পকের সঙ্গে হলদিয়া গিয়ে আমি তিন-চারদিন আটকে গেলুম।

ইন্টারভিউ বোর্ডে চম্পকের চেনা বেরিয়ে গেল একজন। ওর জামাইবাবুর বন্ধু। চম্পক যদি ঘুণাক্ষরেও জানতো যে অরবিন্দ রায় মাত্র কয়েক মাস আগে এই মাল্‌টি-ন্যাশনাল কম্পানিতে যোগ দিয়েছেন তাহলে ও আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারতো। অরবিন্দ রায় ওদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার এসেছেন ব্যাডমিন্টন খেলতে। চম্পকদের বাড়ির উঠোনে প্রত্যেক বছর নেট টাঙানো হয়।

ইন্টারভিউ দিতে ঢুকে চম্পক দারুণ চমকে উঠেছিল,কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করেনি। ইন্টারভিউ বোর্ডে নিজের মামা থাকলেও তাকে মামা বলে না ডেকে স্যার বলতে হয়।

মোটামুটি উত্তর ভালোই দিয়েছে চম্পক, শুধু দুটো প্রশ্নের বেলায় একটু থতোমতো খেয়েছিল। তখন অরবিন্দ রায়ই উদারভাবে বলেছিলেন, অল রাইট, অল রাইট, দ্যাট উইল ডু!

সুতরাং চম্পক ধরেই নিয়েছিল যে চাকরি হয়ে গেছে। ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় লাফায় আর কি!

উচ্ছ্বাস একটু কমবার পর চম্পক বললো, এখন সবচেয়ে জরুরি কাজটা কী জানিস? এখানে একটা সুবিধেমতন থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা। পোস্টিং তো হবে এখানেই। এরা কোয়ার্টার দিতে পারবে না আগেই বলে দিয়েছে।

আমি বললুম, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা কবে দেবে, এখন না ছ'মাস বাদে, সেই পাকা খবরটা নে আগে!

—আরে অ্যাপয়েন্টমেন্টে সামনের মাস থেকেই। ওরাই তো জিজ্ঞেস করলো, আমি এক্ষুণি জয়েন করতে রাজি আছি কিনা! অরবিন্দ রায় যখন আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখ দিয়ে হাসি ফুটে বেরুচ্ছিল!

—চম্পক, আমি তো শুনেছি, কার কার চাকরি হবে তা আগে থেকেই ঠিক হয়ে থাকে। ইন্টারভিউটা একটা ফার্স।

—সে তোদের গভর্নমেন্ট অফিসে হয়। এসব বিলিতি কোম্পানিতে ওসব চলে না। তাছাড়া আমি অরবিন্দ রায়ের সঙ্গে ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গল্‌স ফেলেছি, তুই জানিস? আমার জামাইবাবু, মানে প্রকাশদার বুজুম ফ্রেন্ড।

তবু সন্ধের পর আমরা কম্পানির গেস্ট হাউস খুঁজে বার করে অরবিন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

দু'পাশে ব্যর্থ বাগান-চেষ্টা, মাঝখানে সুদর্শন দোতলা বাড়ি, সব কটি ঘরেই আলো জ্বলছে। বাংলোতে ঢোকার সময়েই আমার কেয়রটেকার বা দারোয়ানের কথা মনে পড়ে। সেরকম কেউ নেই, আমরা গেট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

সামনের বারান্দায় আমাদেরই বয়েসী একজন যুবক চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছে। মফস্বলের দিকে এরকমই হয়। এরা সন্ধেবেলা কাগজ পড়ে। আমাদের দেখে যুবকটি মুখ তুলে বললো, কী চাই?

আমরা আমাদের মনোবাঞ্ছা জানালুম। যুবকটি বললো, মিঃ এ কে রায়? হ্যাঁ, তিনি আছেন ঘরে, কিন্তু এখন তো দেখা হবে না।

আমরা বললুম, আমাদের বিশেষ দরকার আছে।

যুবকটি রূঢ় অভদ্র নয়। বরং একটু গূঢ়ভাবে হেসে কিছু যেন একটা বোঝাবার চেষ্টা করে বললো, এখন দেখা করার মুশকিল আছে।

চম্পক এবারে জোর দিয়ে বললো, আপনি গিয়ে বলুন, ওঁর বন্ধু প্রকাশবাবুর কাছ থেকে এসেছি। প্রকাশ মজুমদার, শিবপুরের প্রফেসার।

লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে গেল। একতলাতেই অরবিন্দ রায়ের ঘর সেখানে আরও লোকজন আছে বোঝা যায়।

একটুবাদে অরবিন্দ রায় বেরিয়ে এলেন পাজামা পাঞ্জাবী পরে। বেশ সুপুরুষ। বিলেত-ফেরৎ অফিসারদের মতন মুখের ভাব। কিন্তু তিনি একটি অদ্ভুত ব্যবহার করলেন। প্রথমে চম্পকের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী খবর?

আমি বললুম, আমি চম্পকের বন্ধু, ওর সঙ্গে এসেছি।

এবারে তিনি চম্পকের দিকে ফিরে অধীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কী ব্যাপার?

চম্পক আকাশ থেকে পড়লো। উনি তাকে চিনতে পারছেন না! চম্পক চট করে একবার তাকালো আমার দিকে। তারপর ম্রিয়মাণ ভাবে বললো, প্রকাশ মজুমদার আমার জামাইবাবু হন, আপনার বন্ধু..

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বুঝলুম। এখানে কী ব্যাপার?

—আজ দুপুরে আমি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছি আপনাদের কম্পানিতে..

—ইন্টারভিউ? আজ দুপুরে..

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কী রকম যেন একটা অপ্রস্তুত ভাব।

সেই দীর্ঘশ্বাসটিতে আমি বিলিতি মদের গন্ধ পেলুম। বিলিতি কম্পানির বড় অফিসার, সন্ধের পর মদ্যপান করবেন সহকর্মী বা বন্ধুদের সঙ্গে, এতে আর আশ্চর্যের কী আছে? সেজন্য ইনি লজ্জা লজ্জা ভাব করছেন কেন?

প্রায় মিনিট খানেক চুপচাপ থেকে তারপর অরবিন্দ রায় বললেন, তুমি ইন্টারভিউ দিচ্ছো, সে কথা প্রকাশ তো আমায় কিছু জানায়নি! ঠিক আছে, তুমি কাল সকালে একবার দেখা করো আমার সঙ্গে... ও না, না, কাল সকালে তো সময় হবে

না, ওয়ার্কশপ ইনস্পেকশান আছে কাল দুপুরে .. পর পর দুটো মিটিং, তুমি বিকেলবেলা দেখা করো, এখানে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময়। আচ্ছা?

এই বলেই অরবিন্দ রায় পেছন ফিরলেন। আমি আর চম্পক নেমে পড়লুম সিঁড়ি দিয়ে। গেটের কাছে পৌঁছেছি, তখন অরবিন্দ রায় আবার ডেকে বললেন, এই যে, ইয়ে, শোনো, তোমার নামটাই তো জানা হয়নি।

চম্পক ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের নাম বললো।

—তোমরা উঠেছো কোথায়? তোমার বন্ধুটি কি লোকাল?

—না, আমরা দু'জনেই কলকাতা থেকে এসেছি, দুর্গাচকের একটা হোটেলে উঠেছি।

—কাল বিকেল পর্যন্ত থাকলে শুধু শুধু তোমাদের হোটেল খরচ হবে। এক কাজ করতে পারো... এখানে তো সম্ভব নয়, আমাদের আর একটা গেস্ট হাউস আছে, সেখানে উঠতে পারো, আমি বলে দিচ্ছি...।

অরবিন্দ রায়ের চরিত্রটি যে বেশ বিচিত্র তা বলতেই হবে। চম্পকের সঙ্গে উনি একাধিকবার ব্যাডমিন্টন খেলেছেন, তবু ইন্টারভিউ বোর্ডে বসে তিনি ওকে চিনতে পারেননি। এ রকম হয় নাকি? আমাদের সঙ্গে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'মিনিট কথা বলে উনি বিদায় করে দিতে চাইছিলেন, তারপর আবার অযাচিত ভাবেই থাকার জায়গা ঠিক করে দিলেন!

কেয়ার টেকার যুবকটি আমাদের দ্বিতীয় গেস্ট হাউসে পৌঁছে দিল। এটা একটু নিরেশ ধরনের। জনতা টাইপ। চ্যাপ্টা ধরনের বাড়ি, খান দশেক ঘর। বোধহয় কোম্পানির হেড অফিস থেকে কেরানি-টেরানিরা এলে এটাতে ওঠে।

কিন্তু আমাদের হোটেলের ঘরটি একেবারেই বুক-চাপা, জানলা দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। সেই তুলনায় এখানে আলো-হাওয়া আছে। রাত্তিরেই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে এলুম এখানে। এখানকার ক্যান্টিনে মাংস-ভাত বেশ সস্তা অতিরিক্ত ঝোল চাইলে তার সঙ্গে দু' এক টুকরো আলুও দেয় বেশ উদারভাবে।

পরদিন বিকেলে অরবিন্দ রায়ের কাছে আমি আর যেতে চাইলুম না। চাকরির খোঁজখবরের ব্যাপারে কোনো বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া ঠিক সঙ্গত নয় বোধহয়।

চম্পককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একা পাঠিয়ে আমি বেড়াতে লাগলুম হলদি নদীর ধারে। এখানে খেয়া নৌকো চলে। অনেকেই ওপারে যাচ্ছে। খেয়া নৌকো দেখলেই আমার অন্য পারে যেতে ইচ্ছে করে। অন্ধকার নামবার আগে চম্পক ফিরে এল একবার ওপরটা ঘুরে আসতে হবে!

... রোমির মতন মেয়ে, যাদের দেখলেই মনে হয়, অন্য অনেকের স্তুতি পাবার জন্যই এরা জন্মেছে, তাদেরও জীবনে সমস্যা থাকে? কেন থাকবে না? কোথায় যেন পড়েছিলুম, সুন্দরী মেয়েরা কখনো সুখী হয় না। ক্লিয়োপেট্রাকে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল...

না, না, এসব আমি বাজে কথা ভাবছি। রফিকের কথার কোনো গুরুত্ব দেওয়া যায় না। রফিক অত্যন্ত সুখী ছেলে, আলমারির তলায় একটা ইঁদুর মরে পচা গন্ধ বেরুলে সেটাই ওর জীবনে একটা বিরাট সমস্যা! রোমি এই পৃথিবীর মাটি থেকে

একইঞ্চি ওপরে হাঁটবে, ও কোনোদিন নোংরা কিছু দেখবে না, ওর জন্য এই পৃথিবী আর একটু সুন্দর হবে।

আমি জানি, রোমির সঙ্গে কোনোদিন আমার অন্তরঙ্গতা হবে না, কোনোদিন আমরা নিরালায় মুখোমুখি বসে ভুল বোঝাবুঝিগুলো শুদরে নেবো না। ভালোবাসা তাকেই বলে যখন একজন আরেক জনের কথা ভাবলেই বুকটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে যায় শুধু তাকেই জায়গা দেবার জন্য।

রোমির প্রতি আমার যেটা হয়েছে সেটা চোখের ঘোর, কিংবা সুন্দরের বন্দনাও বলা যেতে পারে। ওসব দূর থেকেই ভালো। সুন্দরের বেশি কাছে যেতে নেই।

টাটকা হাওয়া মুখে ভরে নিয়ে কুলকুচি করতে করতে এক সময় আমি আপন মনে বকে উঠলুম,কি হে, নীললোহিত চন্দর, খুব যে একলা একলা নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দরী মেয়ের ধ্যান করা হচ্ছে! জীবনে কি আর কিছু নেই? কতদিন আর এই রকম গায়ে ফু দিয়ে বেড়াবে? কোনো দায়িত্ব নিতে হবে না! কথায় বলে, কাঁধে একটা দায়িত্বের জোয়াল না চাপলে ছেলেরা ঠিক পুরুষ মানুষ হয়ে ওঠে না!

ভেতর থেকে আমার অলটার ইগো উত্তর দিল, দ্যাখো বাপু, বেশি উপদেশ ঝেড়ো না! সবাইকেই যে চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জীবনের উন্নতি, সামাজিক কর্তব্য এই সব নিয়ে মেতে থাকতে হবে তার কি কোনো মানে আছে! দু'চারটে থাক না একটু ছন্নছাড়া! তারা নিয়মের বিরুদ্ধে চলুক, তা হলেই ব্যালান্স ঠিক থাকবে।

—এটা হলো ফাঁকির কথা। পলায়নপন্থীর যুক্তি!

—পলায়ন পন্থাটা কি সব সময় খারাপ নাকি? মনে করো, উদাসীনতা। সেটাও তো বাস্তব অবস্থা থেকে পলায়ন। সেটাকে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে দিতে চাও? তাহলে তো পৃথিবীর অর্ধেক দর্শন আর কবিতাই বরবাদ হয়ে যাবে?

—ফরগেট ইট! তুমি দার্শনিকও নয়, কবিও নয়। তুমি হচ্ছো একটি রোমান্টিকতার ফাঁপা মানুষ!

—গালাগাল দেওয়া খুব সোজা। আজকাল সবাই সবাইকে মওকা পেলেই এক হাত নিয়ে নিচ্ছে। আমি একটা সোজা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। একটি সুন্দর সৃষ্টি, একটি বাইশ বছরের নারী, আমি যার কোনোদিন হাতটাও ছুঁয়ে দেখবো না– শুধু মনে মনে যদি আমি তার কথা চিন্তা করে, অর্থাৎ দিবা স্বপ্ন দেখে আনন্দ পাই তাতে দোষের কী আছে?

— সেই সময়টা তুমি আরও ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারতে!

— কাজ! একটা সত্যি কথা বলবো! আজকাল যে যত বেশি কাজ করছে, সে ততই পৃতিবীটাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে!

— অদ্ভুত বোকার মতন কথা!

— বোকাই তো, আমি একটা বোকা। ধুরন্ধরদের নিয়েই তো যত বিপদ! মনে করো, একজন বড় বৈজ্ঞানিক, তাঁর খুব বুদ্ধি। ঠিক তো? কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিকের বুদ্ধি দিয়ে কী হয়? মানুষ মারার নতুন নতুন অস্ত্র তৈরি হয়!

— তোমার সঙ্গে কোনো কথাই বলা যায় না!

— বলো না!

— বাঃ! তোমাকে একটু অবসর দিলেই তো তুমি অমনি সেই রোমি নামের মেয়েটাকে নিয়ে ধ্যান শুরু করবে!

— রোমি, রোমি, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করলুম। বিদেশী বাতাস এসে তোমাকে নিয়ে চলে যাবে আমি জানি!

এক ঘন্টা বাদে ফিরে এলো চম্পক। চোখমুখ খুবই উজ্জ্বল। চাকরি পাওয়া সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিন্ত। অরবিন্দ রায় ডেফিনিট কথা দিয়েছেন। মিনিট পনেরো ধরে অরবিন্দ রায়ের প্রতিটি সংলাপ আমার কাছে দু'বার ধরে পুনরুক্তি করার পর চম্পক হঠাৎ থেমে গেল।

আমার ডান বাহু ধরে, গাঢ়ভাবে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে চম্পক বললো, এখন সব কিছু তোর ওপর নির্ভর করছে! তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে!

চম্পক যদি চাকরি পেয়ে গিয়েই থাকে, তা হলে তারপর আর কী জরুরি কথা আছে!

চম্পক যদি চাকরি পেয়ে গিয়েই থাকে, তা হলে তারপর আর কী জরুরি কথা থাকতে পারে আমার সঙ্গে? সারা জীবনটাই কি ও জরুরি অবস্থায় কাটিয়ে যাবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি বললুম, আমার সাহায্য? কী ব্যাপার, বল্!

— দ্যাখ নীলু, আমি মোটেই ইনকনসিডারেট নই। আমার চাকরির ইন্টারভিউ, তুই এমনি এমনি আমার সঙ্গে এসেছিস,কটা বন্ধু এ রকম আসে?

— তুই তো আমার বাস ভাড়া দিয়েছিস, হোটেল খরচ দিচ্ছিস, তা-হলে আসবো না কেন? সবাই আসবে!

— না রে, নীলু, না! বাস ভাড়া, হোটেল খরচা ছাড়াও সময়ের একটা দাম নেই? অন্য কে নিজের কাজ ফেলে আসবে! তাছাড়া আমি জানি তো, অনেকেই এইসব ব্যাপারে খুব হিংসে করে। সেদিন দেখলি না বরুণ তোকে ভাঙিয়ে পাটনায় নিয়ে যেতে চাইছিল।

— আমি কি এম এল এ যে আমাকে অন্য কেউ ভাঙিয়ে নেবে? তুই কী জরুরি কথা বলবি বলছিলি?

— হ্যাঁ, সেটাই তো মোস্ট ইমপর্টান্ট! অরবিন্দ রায় যখন বললেন যে আমার চাকরিটা হবেই তখন আমি ওঁর কাছে অন্য একটা কথা পাড়লুম অবশ্য তোর কাছ থেকে অনুমতি নিইনি, অনেকটা নিজের দায়িত্বেই।

— আমার অনুমতি?

— আমি অরবিন্দদাকে বললুম, কাল আমার যে বন্ধুকে দেখেছিলেন, ক'লকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছে, ওরও কোনো চাকরি বাকরি নেই, আপনি ওর জন্যও যদি একটা ব্যবস্থা করে দেন...

— তুই, তুই চম্পক আমার চাকরির জন্য ভিক্ষে চাইলি?

— আরে চটে যাচ্ছিস কেন? ভিক্ষে মোটেই নয়। অরবিন্দদা আমার সঙ্গে খুব ফ্রেণ্ডলি ভাবে গল্প করছিলেন, আমায় চা খাওয়ালেন। তোর সম্পর্কে খুব ইন্টারেস্টেড। তুই আমার সঙ্গে এসেছিস শুনে বললেন, আজকাল কি কোনো বন্ধু অন্য বন্ধুর জন্য এতটা করে? তাতেই আমি কথায় কথায় বললুম, আপনি যদি আমার বন্ধুর জন্যও একটা চাকরি করে দেন!

—উনি কী বললেন?

— একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর জানতে চাইলেন তোর কোয়ালিফেকেশন।

—আমার তো কোয়ালিফিকেশান কিছুই নেই।

—শোন না তারপর কী হলো! অরবিন্দদা খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, হ্যা, ওর জন্য একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ইন ফ্যাক্ট পোস্ট খালি আছে, তার জন্য বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়নি। তোর কি ভাগ্য বল তো নীলু!

—তুই কি পাগল হয়েছিস চম্পক? দরখাস্ত করিনি, কিছু না, এমনি এমনি কেউ চাকরি দিতে চাইলেই বা আমি নেবো কেন? আমার তো এইটাই একমাত্র অহঙ্কার, কেউ কিছু দিতে চাইলেও আমি চট করে নিতে রাজি হই না। সে আমার যতই অভাব থাক্...

—শোন, নীলু, তোর ওপরেই আমার হলদিয়ার চাকরিটা নির্ভর করছে।

—তার মানে?

অরবিন্দদা তোকে কী চাকরি দিতে চাইলেন, তুই তো সেটা শুনলিই না!

—যেটা আমি নিতে চাই না, সেটার কথা আমি শুনেই বা কী করবো?

—শুনলেই তুই নিতে চাইবি। আমরা এখন যে বড় গেস্ট হাউসটায় আছি, সেটার জন্য একজন কেয়ার টেকার দরকার। সেই পোস্টটাই খালি আছে।

—কেয়ার টেকার?

—ডেজিগনেশানটাই শুনতে তেমন কিছু নয়, কিন্তু মাইনে খারাপ না। স্টার্টিং প্রায় আমারই সমান। ইয়ে, মানে তোর তো কোনো টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান নেই! আমি অরবিন্দদাকে বললুম, আমার ঐ বন্ধু খুব সিনসিয়ার আর হার্ড ওয়ার্কিং...

— ক্যারেকটার সার্টিফিকেটের ভাষায় কথা বলা বন্ধ কর তো! তুই কি ভেবেছিস, এই চাকরির কথা শুনে আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠবো?

—আমরা দু'জনে একই জায়গায় থাকবো, নীলু! বুঝতে পারছিস না, এটা একটা কত বড় সুযোগ! আজকাল চাকরির জন্য স্বামী-স্ত্রীকেও আলাদা আলাদা থাকতে হয়, আমার দিদিদেরই দেখ না, জামাইবাবু শিবপুরে আর দিদি নর্থবেঙ্গল ইউনিভার্সিটিতে...।

—কলকাতা ছেড়ে আমি হলদিয়াতে থাকবো? ভাগ্!

—স্বার্থপরের মতন কথা বলিস না, নীলু। তুই না থাকতে চাইলে আমারও থাকা হবে না। আমরা যে গেস্ট হউসে উঠেছি, ওটার জন্যই একজন কেয়ার টেকার দরকার। ভেবে দ্যাখ, তুই ঐ চাকরিটা নিলে আমিও ওখানেই পার্মানেন্ট বোর্ডার হয়ে থাকবো, আমাকে আর বাড়ি-ফাড়ি খুঁজতে হবে না—

আমি কথা থামিয়ে চম্পকের দিকে চেয়ে রইলুম। স্বার্থপরতা কার, আমার? আমি ঐ গেস্ট হাউসের বাজার-সরকারের চাকরি নিলে চম্পক ওখানে আরামে থাকবে, ওকে আর বাড়ি খুঁজতে হবে না।

অবশ্য চম্পকও বলতে পারে যে এই বাজারে কেউ কোনো চাকরি পায় না। চম্পকই তো উদ্যোগ করে আমার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করেছে।

চম্পক আবার বললো, তোর থাকাখাওয়া ফ্রি। তা হলেই বুঝে দ্যাখ নীলু, তোর কত টাকা বেঁচে যাচ্ছে। এই সব চাকরিতে মাইনে খুব বেশি না হলেও লাভ বেশি। মাইনে বেশি হলে তো ইনকাম ট্যাক্সই সব কেটে নেবে।

আমার চোখের সামনে একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো। গেস্ট হাউসের বারান্দায় আমি সন্ধেবেলা বসে চা খাচ্ছি আর সদ্য-আসা খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় একজন গেস্ট এসে বললো, এই যে ভাই, আমার বাথরুমের ফ্ল্যাসটা কাজ করছে না, একটা কিছু ব্যবস্থা করুন! আর একজন বললো, কী ব্যাপার মশাই, সাতবার চেয়ে চেয়ে এক কাপ চা পাই না আর নিজে তো দিব্যি চা প্যাঁদাচ্ছেন... এই যে দাদা,বিছানায় কি স্পেশাল সাইজের ছারপোকা ছেড়ে দিয়েছেন? একে তো মশার জ্বালায় ঘুমোতে পারি না... কেয়ার টেকার ভাই, আপনার কাছে ছিপি-ওপ্‌নার আছে? বরফ পাওয়া যাবে? আলাদা টাকা দিচ্ছি, ইলিশ মাছ এনে একটু স্পেশাল করে ভাজিয়ে আমাদের ঘরে পাটিয়ে দিন না...

এখান থেকে পালাতে হবে।

চম্পক এবারে কলকাতার নিন্দে শুরু করে দিল। কলকাতায় কি মানুস থাকে? বাতাস এত পলিউটেড যে প্রতিটি নিশ্বাসেই বিষ। সী-পোর্ট, এয়ারপোর্ট দুটোই প্রায় বাতিল হয়ে গেছে, কলকাতার আর আছে কী? পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যৎ এখন হলদিয়াতে। আর এক দশকের মধ্যেই কলকাতা একেবারে ডেড সিটি হয়ে যাবে, ততদিনে শুধু শিল্প-বাণিজ্য নয়, আর্ট অ্যাণ্ড কালচারের সেন্টারও হবে এই হলদিয়া। বুঝলি, নীলু?

আমি প্রতিবাদ না করে ঘাড় নেড়ে; যেতে লাগলুম।

কলকাতার অবস্থা এখন কাদায় পড়ে যাওয়া হাতির মতন। ব্যাঙও লাথি মেরে যেতে পারে। তবু মরা-হাতি লাখ টাকা।

চম্পক বললো, ধ্যাখ তো, এখানকার বাতাস কত টাটকা। ফ্রেস মাছ পাওয়া যায় নদী থেকে। এখানকার মানুষ জনও খুব ফ্রেণ্ডলি। আমরা যে দু'দিন এখানে আছি, এর মধ্যে একজনের কাছ থেকে অভদ্র ব্যবহার পেয়েছি?

রাত্তিরেই চম্পক আমাকে দিয়ে একটা অ্যাপ্‌লিকেশন লেখালো। সকালে ঐ দরখাস্ত হাতে নিয়ে অরবিন্দ রায়ের সঙ্গে অফিসে দেখা করতে হবে।

সারারাত চম্পকের পাশের খাটে আমি ঠায় জেগে রইলুম। আমাকে একটা ফাঁদে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। যে-কেউ শুনলেই বলবে, সে কি নীলু, এমন লোভনীয় কাজ তুমি নিতে চাইছো না? খাওয়া-থাকা ফ্রি, তাছাড়া মাইনে পাবে, উপরন্তু প্রত্যেক দিনের বাজার খরচ থেকে কিছু মারতেও পারো...

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লুম। চম্পকের ফিঁচ্ ফিঁচ্ করে নাক ডাকছে। দুলাইন একটা চিঠি লিখে চম্পকের মাথার কাছে রেখে দিলুম, তারপর ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে দরজা খুলে বাইরে।

সাড়ে পাঁচটার সময় একটা বাস ছাড়ে। সেই বাসে খানিকটা আসার পর মন বদল করে নেমে পড়লুম কোলাঘাটে। কলকাতাকে আমি এত বেশি কিছু ভালোবাসি না যে এক্ষুনি ফিরতে হবে। দেউলটিতে আমার এক বন্ধু আছে, সেখানে দু' একটা দিন থেকে গেলে মন্দ কী!

।। পাচ ।।

রূপ নারায়নের কূলে জেগে উঠিলাম
জানিলাম
এ জগৎ স্বপ্ন নয়...

রবীন্দ্রনাথ রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠেছিলেন আর আমি রূপনারায়ণের তীরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম এবং একটি বিচিত্র স্বপ্ন দেখলুম।

দেউলটিতে তপনদের বাড়িতে গিয়ে পড়ে গেলুম মহা ফাঁপরে। বাড়ি ভর্তি অনেক লোক এবং সকলেরই প্রায় ফুড পয়জনিং হয়েছে। আজকাল যার নাম আন্ত্রিক রোগ। দু'দিন আগে তপনের দাদার ছেলের মুখে ভাত উপলক্ষে বিরাট ভোজ ছিল। সেদিন কোলাঘাটে প্রচুর ইলিশ উঠেছিল, তাই খেয়েই নাকি এই বিপত্তি। ইলিশের মতন চমৎকার মাছের নামে এই বদনাম, অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কী!

যাক, তপনের দাদার ছেলের কিছু হয়নি।

তপন বিছানায় শুয়ে চিঁ চিঁ করছে। ওদের বাড়ির তিনজনকে পাঠানো হয়েছে হেল্‌থ সেন্টারে, তপন নিজে কাল পর্যন্ত সুস্থ ছিল, আজ সে-ও পড়েছে।

সত্যি কথা বলছি,ও বাড়িতে পা দিয়েই স্বার্থপরের মতন ঠিক করে ফেললুম, এখানে আমি জল গ্রহণ করছি না। কোনো একটা অছিলায় অবিলম্বেই সরে পড়তে হবে। আমি তো তপনের চিকিৎসার কোনো সাহায্য করতে পারবো না। তপনদের বেশ বর্ধিষ্ণু পরিবার, অনেক লোকজন। তাছাড়া গ্রামেও ওদের বহু আত্মীয়- স্বজন, সুতরাং দেখাশুনো করবার লোকের অভাব হবে না।

তপন কিন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে যে আমি ওদের বাড়িতে থাকবার উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছিলুম। কলকাতার মানুষ এতদূরে কোনো গ্রামে বন্ধুর সঙ্গে ক্ষণেক দেখা করার জন্য আসে না। তাছাড়া তপন আমার স্বভাব জানে।

তপন বললো, তুই আমার পিসিমার বাড়িতে থাকবি, আমি বলে দিচ্ছি,ও বাড়িতে কারুর অসুখ করে নি!

কিন্তু সেটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। ওর পিসিমার বাড়িতে কারুকে চিনি না শুনি না.. সুতরাং গল্প বানাতে আরম্ভ করলুম। দীঘা থেকে ফিরছিলুম, ব্রীজের ওপাশে বাস খারাপ হয়ে গেছে, সরকারি বাস, টিকিটের দাম ফেরৎ দেবে না, আমার কাছে পয়সা নেই, আজ কলকাতায় ফিরতেই হবে, কাল আমার চাকরির একটা ইন্টারভিউ, তপনের কাছে এসেছিলুম দশটা টাকা নেবার জন্য, অবশ্য ওর এই অবস্থা দেখে..।

তপন ওর বালিশের তলার মানি ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে দিল। অত টাকা আমি কিছুতেই নেবো না, তপন দেবেই দেবে! অসুস্থ মানুষের সঙ্গে বেশিক্ষণ তর্ক করা যায় না।

বাজারে আমার গুডউইল আছে। বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে উদার ভাবে টাকা ধার দিতে দ্বিধা করে না। যারা ধার নিয়ে অমুক তারিখে ফেরৎ দেবো বলে কথার খেলাপ

করে, তাদের ওপর লোকে রেগে যায়। আমি কখনো কথা দিই না। বন্ধুরা এইসব টাকা আমাকে দান হিসেবেই দেয় বোধ হয়, কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করে না।

তপনও বললো, আমি সামনের সপ্তাহে কলকাতা যাচ্ছি, যদি সেরে উঠি, ধর আগামী বৃস্পতিবার, সেদিন দুপুরে তোদের বাড়িতে যাবো।

অমি বললুম, তুই নিশ্চয়ই সেরে উঠবি। মাকে বলবো, তোর জন্য থানকুনি পাতা দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল রান্না করে রাখতে।

তপনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনটা বেশ অস্থির হয়ে আছে, কিছুতেই কলকাতায় ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় যাই?

বাতাসে বেশ একটা মন খারাপ ঘ্রাণ। আকাশ মেঘলা। একটা দোয়েল কোন্ গাছে বসে ডাকছে, দেখতে পাচ্ছি না।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে অচেনা কেউ হাঁটলে অনেকেই ফিরে ফিরে তাকায়। এদিকে আজকাল সাইকেল রিক্সা চলে। একজন রিক্সাওয়ালা আমার পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাবেন? পানিত্রাস?

নামটা শুনে মনে পড়লো। হ্যাঁ, কাছেই তো শরৎচন্দ্রের বাড়ি। গেলে হয়। শর ৎচন্দ্রের বাড়িটা আমার বেশ পছন্দ। বিশেষত দোতলার বারান্দাটা। শরৎচন্দ্র বেঁচে থাকলে আজ তাঁর বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যাবার আবদর ধরতুম।

ছুটির দিনে এখানে অনেকে আসে। আজ বাইরের কেউ নেই। বাড়ির পেছন দিকে একটা ধানের গোলা, সেখানে কিছু লোক জটলা করছে। আমি ওপরে উঠে গেলুম, কেউ আপত্তি করলো না।

আফিং খেয়ে মৌতাত করার জন্য শরৎচন্দ্র এখানে ইজি চেয়ারে বসে থাকতেন। সম্পাদকরা লেখা চাইতে আসতো এতদূর ধেয়ে। জলধর সেন, উপেন গাঙ্গুলী। তোষামুদেরা এসে বলতো, আপনি রবি ঠাকুরের চেয়েও কত বড় লেখক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর নেতৃত্বে কল্লোলের ছোকরা লেখকদের দলবলও এসেছিল একদিন। তাদের মধ্যে কে যেন ক্যামেরা এনেছে, শরৎচন্দ্রের ছবি তুলতে চায়, কল্লোলে ছাপবে। শরৎচন্দ্র আপত্তি করে বললেন, আহা-হা এই খোলটার ছবি তুলে কী হবে! একটু পরেই ভেতরে গিয়ে মুখে স্নো-পমেটম মেখে কাঁধে একটা মুগার চাদর ঝুলিয়ে এলেন!.. সে ঘটনাটা কি এখানেই ঘটেছিল, না বাজে শিবপুরে?

সেই ফাঁকা বারান্দায়, কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সংলাপ শুরু করলুম।

—এবারে পূজো সংখ্যায় ক'টা উপন্যাস লিখছেন?

—ক'টা তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? আমি আজকালকার এইসব লেখকদের মতন ঝুড়ি বরাদ্দে উপন্যাস লিখি? না না না, লেখাটেখার কথা আমাকে বলো না আজকাল আমার লিখতে একেবারেই ইচ্ছে করে না!

—তবু?

—অ্যাঁ? তুমি কিছু খেয়েছো তো? মুখ শুকিয়ে গেছে দেখছি। দুধ-মুড়ি আর কলা খাবে! আমার খেতের ধানে মুড়ি হয়েছে, বেশ মুচমুচে। দুধও আমার বাড়ির গরুর। এ গরু আমি ভাগলপুর থেকে আনিয়েছি। কলাও আমার বাগানের। নিজে হাতে

কলাগাছ পুঁতেছিলুম। অতি খাষা এক কাঁদি মতমান কলা ফলেছে। খেয়ে দ্যাখো।

—আহা, আজকালকার বেচারা লেখকরা! তাদের কারুরই বাড়িতে গরু নেই, টাটকা দুধ কাকে বলে জানে না। নিজস্ব ধান জমি আর কলাগাছ...হায় রে!

দ্যাখো বাপু, আমিও অনেকদিন না খেয়ে-দেয়ে কাটিয়েছি। বার্মায় এক সময় এত ধার হয়ে গেসলো...

—তা তো জানিই। আপনি কত কষ্ট করেছেন। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। আপনি ভগবান মানতেন?

—আমার লেখা পড়ো নি? কী মনে হয়?

—আপনার সব বই-ই স্কুল-বয়েসে পড়েছি, এখন ভালো মনে নেই। আপনার লেখা পড়লে বোঝা যায় না আপনি নিজে নাস্তিক কি না!

—শোনো, আমি নিজে কী বিশ্বাস করতুম না করতুম সেটা আলাদা কথা। কিন্তু এদেশে কোনো লেখক যদি নিজেকে নাস্তিক বলে প্রচার করে, তবে সে পাঠকদের কাছে কল্কে পাবে না। বঙ্কিমবাবুর ব্যাপারটাই দ্যাখো না, আগে শুধু রোমান্স লিখছিলেন, নিছক গল্পখোর পাঠকরা মুগ্ধ হয়েছিল, তার বেশি কিছু না। তারপর আনন্দমঠে যেই দুর্গা প্রতিমার একখানা বেশ রমরমা গোছের বর্ণনা দিলেন অমনি সবাই কেঁদে ভাসালো। ঠিক কিনা!

—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো ঠাকুর দেবতার বর্ণনা দেননি কোথাও? বরং রাজর্ষিতে কালীপুজোর নিন্দেই করেছেন প্রকারান্তরে।

—উনি যে কথায় কথায় পরম ব্রহ্মকে নিয়ে আসতেন! উপনিষদ আর বৈষ্ণব সহজিয়াতত্ত্বকে হুইস্কি আর সোডার মতন মিলিয়ে দিতেন বেশ মাপে মাপে।

–আপনি রবীন্দ্রনাথকে পছন্দ করেন না, তাই না? উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, আপনার ধারণা আপনারও নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত ছিল...

–আরে রামো রামো, এসব কী কথা? ছি ছি ছি ছি! উনি আমাদের সকলের নমস্য। বাপু হে, জানো তো, গঙ্গায়ই ঢেউ হয়। ঢেউ-এর কাখনো গঙ্গা হয় না। আমরা হলাম গিয়ে ঢেউ। উনি গঙ্গা।

–এই কথাটা তো ছাপার জন্য আপনি আগেও অনেকবার বলেছেন।

–আমার কী পাওয়া উচিত ছিল না?

–কী?

–ঐ নোবেল প্রাইজ? মন্টু আমায় বলেছিল..যারা পায়, তারা কি সবাই আমার থেকে বড়?

– মোটেই না। কত সাহেব রাম-শ্যাম-যদু-মধু পায়! আপনার নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত ছিল, রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে থাকতেই। তাহলে বেশ মজা হতো!

–ম'জা?

–মাপ করবেন, আমার এক বন্ধু, রফিক, প্রায়ই এই রকম ক্ষেত্রে মজা কথাটা ব্যবহার করে। তাই আমার মুখে এসে গেল। সত্যি আপনি নোবেল প্রাইজ পেলে আমরা খুব খুশী হতুম। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? যদি অনুমতি দেন।

–নির্ভয়ে বলো!

—এই উনিশ শো চুরাশি সালে আপনি যদি একটা উপন্যাস লিখতেন, তা হলে কোন্ বিষয় নিয়ে লিখতেন!

—লিখছি তো! ওদের কি এড়ানো যায়? শারদীয় সংখ্যায় খান দুই তো লিখতেই হবে। অমুক আর অমুক কাগজ থেকে তমুক আর তমুক ঘন ঘন আসছে। ট্রেনে আসে না, নিজেদের গাড়িতে আসে। ওদের ভালো করে খাইয়ে-দাইয়ে বলি, বাপু হে, এবার আমার লেখার হাত থেকে নিষ্কৃতি দাও। তা কি শোনে! অমুক কাগজের তমুক তো বললে, আজ অন্তত দুটো স্লিপ না দিলে উঠবোই না!

—কী নিয়ে লিখছেন?

—আন্দাজ করো তো!

—আপনি এত বড় লেখক। আপনার মনের কথা কি আমি বুঝতে পারি? যদি একটু আভাস দেন—

— শোনো, বুঝিয়ে বলি! এখন,এই বর্তমান সময়ে...

দোতলার বারান্দায় কখন যে ধুতি আর ফতুয়া পরা একটি লোক উঠে এসেছে টেরও পাই নি। চটি ফটফটিয়ে লোকটি আমার কাছে এসে বার্লি-খাওয়া মুখ করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি?

অর্থাৎ আমি যদি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা এস-পি হই, তা হলে লোকটি আভূমি ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাবে। আর আমি যদি নীললোহিত নামে এলেবেলে কেউ হই তাহলে লোকটি বলবে, আপনার এখানে কী চাই?

আমি প্রথমে মনে মনে বললুম, বোকচন্দর, আমি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সিরিয়াস আলোচনা করছিলুম, তুমি সেটা নষ্ট করে দিলে? তোমায় আমি অভিশাপ দিচ্ছি, তুমি কোনোদিন বই পড়ে আনন্দ পাবে না!

তারপর প্রকাশ্যে বিনীতভাবে বললুম, আমি এমনিই এদিকে বেড়াতে এসেছি।

লোকটির মাথাটি ডিমের আকৃতির, চকচকে টাক। সেই টাকে হাত বুলোতে বুলোতে গম্ভীরভাবে বললো, কিন্তু আমরা যে দুপুরে বন্ধ রাখি?

আমি নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলুম, কী বন্ধ রাখেন?

—এই বাড়ির দরজা!

—আর রাত্তিরে কী করেন?

—অ্যাঁ? কী বলছেন!

—বলছি যে রাত্তিরে কি এ বাড়িতে কেউ থাকে?

—থাকে। ওপরে থাকে না।

—আমি থাকবো!

—থাকবো বললেই কি আর থাকা যায়। হে হে হে।

—কিন্তু আমার থাকতে হবে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরি কথা আছে!

—অ্যাঁ?

রাত্তিরবেলা আমি এখানে থাকবো, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমর জরুরি কথাবার্তা আছে। উনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন!

ভদ্রলোক এবারে বারান্দা দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বললেন,ওরে হরু, একবার ওপরে আয় তো বাবা!

আমি এবারে দম ফাটিয়ে হা হা করে হেসে উঠলুম।

তারপর লোকটির কাছে গিয়ে কাঁধ চাপড়ে বললুম, আপনি ভাবছেন বুঝি আমি পাগল! হাওড়ার ডি–এম পি চৌধুরীর নাম শুনেছেন তো? আমি তাঁর শালা।

এমনভাবে কথাটা বললুম, যেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের শালা হলে তার যত খুশি পাগলামি করার অধিকার আছে।

লোকটির বিস্মিত মুখের সামনে ম্যাজিকের ভঙ্গিতে হাত তুলে আবার বললুম, ডি–এম সাহেব এদিকে ইন্‌স্‌পেকশানে এসেছেন, নাউপালা ডাকবাংলাতে উঠেছেন। আমার বাংলোটা ভালো লাগলো না। তলায় অফিস, অনেক লোকজন..।

ভদ্রলোক এবারে বললেন, ডি–এম সাহেব এদিকে এসেছেন! ওনার সঙ্গে..উনি বলেছিলেন.. আমরা দেখা করতে..

আমি লোকটির দিকে এবারে বুদ্ধের ভঙ্গিতে অভয় মুদ্রা দেখালুম। তারপর বললুম, ডি–এম সাহেব আজ সন্ধেবেলা কিংবা কাল সকালে এখানে আসবেন। আমি ওঁকে বলে এসেছি, আমি ডাকবাংলোতে থাকবো না, এখানে থাকবো। রাত্তিরে একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন তো!

–নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!

–গরমকাল, বিছানা–পত্তরের তো তেমন দরকার নেই, এই বারান্দাতেই শুয়ে থাকতে পারবো।

–বিছানারও ব্যবস্থা হয়ে যাবে স্যার!

এই রকম খেলা অনেকক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। ধরা পড়ার ভয় কিছু নেই। দৈবাৎ যদি ডি–এম সাহেব এখানে এসে পড়েন হঠাৎ এবং আমাকে চিনতে না পারেন, তাহলে তাঁকে বললেই হবে, ইয়োর অনার, কিংবা স্যার, আপনি আমার বোনকে যে বিয়ে করেননি তার কারণ আমার বিবাহযোগ্যা ভগ্নী নেই. কিন্তু একদিন আপনি আমায় মধুর সম্বোধন করেছিলেন, হয়তো আপনার মনে নেই..

লোকটি বললো, আপনার জন্য একটা চেয়ার বার করে দেবো স্যার?

আমি বললুম, এখন দরকার নেই। আমি একটু ওপারে কোলাঘাট যাচ্ছি, দেখি যদি ভালো ইলিশ–টিলিশ পাওয়া যায়। রাত্তিরে রান্নার ব্যবস্থা করতে হতে পারে–

– সে সব হয়ে যাবে স্যার।

সে বাড়ি থেকে বেরিয়েই আর একটি সাইকেল রিক্সা পাওয়া গেল। ডি–এম –এর শালার হেঁটে যাওয়া উচিত নয়। অবশ্য বম্বে রোডে পড়েই রিক্সা ছেড়ে দিলুম। রিক্সা চেপে নদী পার হবো, আমি এতটা গাধা নই।

শরৎচন্দ্রের আমলে এই ব্রীজ ছিল না। আমরা ছেলেবেলাতেও তো শুনেছি, রূপনারায়ণ নদী খেয়াতে পার হতে হতো। ব্রীজগুলো খুবই প্রয়োজনীয় , তবু খেয়ার জন্য মন কেমন করতে লাগলো।

এবারে বর্ষায় নদীর স্বাস্থ্য অতি চমৎকার।

ওদিকে রেল ব্রীজের পাশে নাউপালা ডাকবাংলোটি দেখা যায়। হয়তো সেখানে

সত্যিই আজ ডি-এম সাহেব এসেছেন। কোনো একটা ব্যাপার বানাবার পর সেটা আস্তে আস্তে আমার কাছে বাস্তব হয়ে ওঠে।

ব্রীজের মাঝখানে একটি বাচ্চা ছেলে একদৃষ্টে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। খুব বাচ্চা নয়, এগারো-বারো বছর বয়স, কালো হাফ প্যান্ট আর সাদা কলার দেওয়া গেঞ্জি পরা। একা ঐ ছেলেটি কোথা থেকে এলো? ওকি ঘরছাড়া পলাতক? মগ্ন চোখ।

আমি ছেলেটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ছেলেটির ঠোঁট নড়ছে, কী যেন বলছে ও । ঐটুকু ছেলে কথা বলছে নদীর সঙ্গে? এ রকম দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি।

ছেলেটিকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলুম। রফিকের কথাটা মনে পড়লো, বয়েসে বড় হলেই দাদাগিরি ফলানো যায় না। ও আপন মনে রয়েছে, কেন আমি ওকে ডিসটার্ব করবো?

আমার উপস্থিতির উত্তাপ বোধ হয় ওর পছন্দ হলো না। একটু বাদে ছেলেটি রেলিং-এর ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো। একবারও ভ্রূক্ষেপ করলো না আমার দিকে।

তারপর সে ব্রীজের অন্য পারের রেলিং ধরে দাঁড়ালো।

ঐ ছেলেটিকে ঘিরে রয়েছে এক মধুর একাকিত্ব। হয়তো ও এই গ্রহের কেউ নয়। যে গ্রহে কোনো নদী নেই ও সেখান থেকে বেড়াতে এসেছে!

ব্রীজটা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার বেশ খিদে পেয়ে গেল। বেলাও যথেষ্ট হয়েছে। এখানে একটি উত্তম মাছ-ভাতের হোটেল আছে, আগে অনেকবার খেয়েছি। ইলিশের ডিম ভাজা পাওয়া যায়।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খেলুম। ভাত, ডাল, আলু, ভাজা, মাছের ডিম ভাজা, শর্ষে-ইলিশ, আমড়ার টক। লেবু, কাঁচালঙ্কা। তাপর দই। রীতিমতন ভোজ। নিজের ওপর পরম একটা মায়া বোধ করছিলুম, যেন আগামীকাল আবার খেতে পাবো কি-না ঠিক নেই, আজ আত্মার সাধ মিটিয়ে নেওয়া যাক!

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেখলুম, আকাশ মেঘ- মেদুর। নরম ছায়ায় মানুষের মুখ বদলে গেছে।

কিছু না ভেবেই আমি কাঠ গুদামের পাশ দিয়ে চলে এলুম নদীর ধারে। নদীর বুকে দূরে [illegible] করে [illegible]টা মাছ ধরার নৌকো। বাতাস বইছে ফিনফিনে। নদীর ধারে কিছু [illegible] খোলা পড়ে আছে, তা ছাড়া জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। বালির চেহারা দেখলে মনে [illegible] জোয়ারের সময় এই জায়গাটা ছাপিয়ে যায়।

[illegible] বালির ওপরে আসন পিঁড়ি হয়ে বসলুম। ব্রীজটা এখান থেকে পুরোটা দেখা যায়। সেই ছেলেটির কথা মনে পড়লো, ওর ঠোঁট নড়ছিল। ও কি নদীর ভাষা জানে?

জলের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ জুড়িয়ে যায়। অন্তরীক্ষে যেন একটা বাঁশি বাজছে। এখন আর কিছুই মনে পড়ে না। সুন্দর এই পৃথিবী। দুর্লভ এই মানব জন্ম।

গতকাল রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, আজ দুপুরের খাওয়াটাও হয়েছে জব্বর। একটু পরেই আমার চোখ টেনে এলো। আকাশে মেঘ বেশ ঘোরালো হয়ে এসেছে,একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। নামুক, তখন দেখা যাবে।

আমি বালির ওপর গা এলিয়ে দিলুম। চোখ বোজার পর দেখতে পেলুম বিচিত্র সব রং। মানুষ দুচোখে কখনো দুরকম জিনিস দেখে না। অথচ এখন যেন আমি দুটো রামধনু দেখতে পাচ্ছি। তারপর রামধনু মিলিয়ে গিয়ে জঙ্গল হলো। নিলয়দার সঙ্গে আমি জিপে করে পালাচ্ছি.. আকেদিন দেখা হয়নি নিলয়দাদেরর সঙ্গে.. রফিক নতুন ফ্ল্যাট পেয়েছে,পার্ক ষ্ট্রিটে একুশতলায়, জানলা খুললেই গঙ্গা দেখা যায়, মাঝখানে রোমি দাঁড়িয়ে, দু'পাশে আমি আর রফিক, আমি বললুম কলকাতার গঙ্গা আর দেখবার মতন নেই, বর্ষাকালে রূপনারায়ণ এত সুন্দর.. রোমি বললো, রূপনারায়ণ নদী কোথায়? আমি কখনো দেখিনি, আমায় নিয়ে যাবেন?

..ইলিশ মাছের ডিম ভাজা..ঐ ব্রীজের ওপর একা বালকটির মতন আমার বয়েস, দিদিমা ঘরের মধ্যে আমায় ডেকে নিয়ে বলছেন, এই ডিম ভাজা খেয়ে নে তো, নীলু! রাবণের গুষ্ঠি..কারুর ভাগে এক দানাও পড়বে না। খা, তুই ভালো করে খা..। দিদিমা শুয়ে আছেন, তাঁর বিছানা ঘিরে অনেক মানুষ, ঘনিয়ে এসেছে শেষ নিশ্বাস, তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, নীলু, নীলু কোথায়?... দিদিমার মুখটা মিলিয়ে গেল... সেই ডিমওয়ালী বুড়ি, কোমরে হাত দিয়ে বললো শীরটা ভালো নেই, রোজার মাস...বাবা, তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে?

।। ছয় ।।

সত্যিকথা বলতে কী, একটা দিবাস্বপ্নকে খুব একটা গুরুত্ব আমি দিই না। কিন্তু কলকাতায় ফিরে পর পর কয়েকদিন বাজার করতে গিয়ে সেই বুড়িকে না দেখে আমি একটু চিন্তিত বোধ করলুম। সেই হাসি খুশী টুসটুসে বুড়িটির সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করা আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে আর আসে না কেন? রোজার মাসে তার শরীর খারাপ হয়েছিল...।

তিন চারদিন তাকে না দেখতে পয়ে সেই হিলহিলে চেহারার কিশোরীটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার পাশে যে ডিমওয়ালী বসতো, তার কী হয়েছে?

মেয়েটি আজ নিয়ে বসেছে একগাদা রাঙালু। ওটা ঠিক আমার কেনার সামগ্রী নয়। আমি তার খদ্দের নই বলেই মেয়েটি আমার কথায় বেশি মনোযোগ না দিয়ে বললো, ও আর আসছে না!

- কেন, কী হয়েছে?

-আমি তার কী জানি?

প্রকৃতি শূন্যস্থান সব সময় পূরণ করে দেয়। একটু দূরেই আর একজন ম্যধবয়স্কা স্ত্রীলোক ডিমের ঝুড়ি নিয়ে বসেছ। সে বললো, ও বাবু ডিম নেবে? আমার কাছ থেকে নাও-

বাজার থেকে আমি ডিম কেনা শুরু করেছিলুম তো ঐ বুড়ির জন্যই। এখন আর আমার ডিমের প্রয়োজন নেই। অন্যদিন শুধু সারা বাজারটা টহল দিই, আজ আর সে রকম উৎসাহ বোধ করলুম না, দায়সারা কেনাকাটি করে ফিরে এলুম।

বাড়ি ফিরেই চম্পকের লেখা একটা চিরকুট পেলাম। " তোর সঙ্গে ভীষণ

জরুরি কথা আছে। সাড়ে দশটার মধ্যে দেখা করবি আমার সঙ্গে। উইদাউট ফেইল। আমি অপেক্ষা করবো তোর জন্য।"

থাক চম্পক অপেক্ষা করে। এমনও তো হতে পারতো আমি এই সময় বাড়িও ফিরলুম না, চম্পকের চিঠিও পেলুম না।

দিনের বেলা আত্মগোপন করার অতি প্রশস্ত জায়গা হলো ন্যাশনাল লাইব্রেরি। একটা এনসাইক্লোপিডিয়া জাতীয় বই মুখে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকলেও সবাই ভাববে দারুণ ব্যস্ত। তাড়াতাড়ি ভাত-ডাল- বেগুন ভাজা-মাছ ভাজা খেয়ে চম্পট দিলুম সেদিকে।

জীবনে কোনোই কাজে লাগছে না, ঘন্টা তিনেক ধরে এমন কিছু জ্ঞান আহরণ করবার পর সিগারেট টানার জন্য বাইরে এসেছি, দেখা হয়ে গেল অরিন্দম আর টিপুর সঙ্গে। আমায় যেমন সবাই নীলু বলে ডাকে, তেমনিটিপুর ভালোনামটাও অনেকেরই মনে থাকে না। অরিন্দম যেমনরোগা পাতলা, টিপু তেমনি গাঁট্টাগোট্টা।

আমাকে দেখেই দু'জন বেশ অবাক ভাব করে থমকে দাঁড়ালো। যেন ন্যাশনাল লাইব্রেরির মতন পবিত্র স্থানে আমি একেবারেই অবাঞ্ছিত।

টিপু ভুরু তুলে শ্লেষের সঙ্গে বললো, বাঃ বেশ! গুরু, যা দেখালে না! হ্যাটস অফ্!

আমি আবার কী করেছি? এইসব ক্ষেত্রে বিস্ময় প্রকাশ না করে চালিয়াতির ভাব করে থাকতে হয়।

অরিন্দম আমার কাঁধ চাপড়ে বললো, সত্যি নীলে, তুই একখানা জিনিস বটে! কী করে বাগালি? চল খাওয়াবি চল!

টিপু আমার পকেট বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলা, মালকড়ি আছে তো? নাকি আমাদের কাছেও ধার চাইবি!

এবারে আমি মুখ খুললুম।

– তোরা দুটিতে এখানে কি করছিস? এ দুপুরবেলা? মেট্রো-সিনেমা যে তোদের জন্য কাঁদছে! বো ডেরেক তিনবার জামা খুলেছে!

টিপু বললো, সত্যি? তোর দেখা হয়ে গেছে? চল, আমাদের দেখাবি চল!

–আমি একটা দরকারি নোট নিচ্ছি। আজ ছ'টা সাতটার আগে বেরুতে পারবো না।

পড়াশুনো? তুই পিলে চমকে দিলে যে রে! তুই কি রিসার্চ করছিস নাকি?

অরিন্দম বললো, পড়াশুনো লোকে কেন করে ভাই? চাকরির জন্য। তোর তো হয়ে গেছে। আর আমি বিস্ময় লুকোতে পারলুম না। চাকরি? আমার?

–ন্যাকা সাজছিস? চম্পক গেল হলদিয়ায় ইন্টারভিউ দিতে, তার চাকরি হলো না। আর তুই বাগিয়ে ফেললি?

–কী যা তা বলছিস, টিপু!

–আজ সকালেই তো চম্পক বলে গেল। চম্পক ভালো ইন্টারভিউ দিয়েছিল, কিন্তু ওর হলো না। আর তুই ইন্টারভিউ না দিয়েই পেয়ে গেলি। মামা আছে বুঝি?

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। চম্পকটাকে নিয়ে আর পার যায় না। এর মধ্যেই সারা কলকাতা রটিয়ে বেড়িয়েছে। তাও চম্পক যা বলেছে, এরা তা ভুল বুঝেছে।

চোয়াল কঠিন করে বললুম, চম্পকটাকে আমি এবার মারবো।

টিপু বললো, কেন তুই ওর চাকরি কেড়ে নিলি!

–যা জানিস না, তা নিয়ে কেন কথা বলতে যাস। চম্পক আমাকে ইনসাল্ট করেছে।

–তুই ওর চাকরি কেড়ে নিয়েছিস বলে চম্পক মোটেই রেগে যায়নি, বেশ খুশী মনেই তো বললো।

– কে বললো আমি চম্পকের চাকরি কেড়ে নিয়েছি? চম্পক গিয়েছিল অ্যাকাউন্টস এক্সিকিউটিভের পোস্টে ইন্টারভিউ দিতে। দুটো কোয়েশ্চেনে ফাম্বল করেছে, তাই ওর চাকরি হয়নি। আর চম্পক আমার জন্য কোন্ চাকরির উমেদারি করেছিল জানিস? দারোয়ানের।

অরিন্দম বললো যাঃ আমাদের ব্লাফ দিচ্ছিস তুই। চম্পক বললো, তোর পোস্ট হলো স্টাফ ওয়েলফেয়ার ম্যানেজার।

–বাজে কথা! ঐ গালভরা নামটা চম্পক নিজে বানিয়েছে। আমাকে দিয়ে যেজন্য দরখাস্ত করিয়েছে, সেটা হলো ঐ কম্পানির সেকেণ্ড গ্রেড গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকারের পোস্ট। অর্থাৎ বাজার সরকার কাম দারোয়ান। আমাকে এরকম বাজে কাজের উপযুক্ত মনে করে। চম্পকের কী অডাসিটি। আমি ওর সঙ্গে আর কোনো কানেকশন রাখবো না।

আমার উপর গুরুত্ব দিল না ওরা দুজন।

টিপু হাসতে হাসতে বললো, গেস্ট হাউসের কেয়ার টেকার, তাই বা মন্দ কী এ বাজারে যা পাওয়া যায়। তুই নিয়ে নে, নিয়ে নে। আমরা হলদিয়া বেড়াতে যাবো, আমাদের খায়িং থাকিং ফ্রি হয়ে যাবে তো!

– তোরা কেউ ঐ চাকরিটা নিতে চাস তো নে না। কিংবা চম্পক নিজেও তো নিতে পারে। চম্পকের জামাইবাবুর বন্ধু রয়েছেন।

–তিনি চম্পকের চাকরিটা করে দিতে পারলেন না? চম্পকের মতন চাকরি–পাগল ছেলে আমরা কেউ দেখিনি। প্রত্যেক মাসে দশ পনেরোটা অ্যাপ্লিকেশান পাঠায়

অরিন্দম বললো, নীলু, সিরিয়াসলি বলছি তুই কিন্তু ঐ চাকরিটা নিয়ে নিতে পারিস। তুই এর চেয়ে ভালো আর কী পাবি বল?

কয়েক পলক আমি অরিন্দমের দিকে চেয়ে রইলুম। ও এরকম আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। হাসিমুখে মানুষকে অপমান করতেই ওর আনন্দ। পৃথিবীতে কে যে কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁচে।

আমি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম ক্যান্টিনের দিকে। জানি ওরা আমাকে ছাড়বে না একটু বাদে এখানে এসে ধরবে। মাঝে মাঝে আমাকে খোঁচা মারলেও ওরা দুজনেই আমাকে ভালোবাসে।

আমার মাথায় একটা অন্যচিন্তা ঢুকে গেছে। চম্পক আমার বাড়িতেও খবরটা জানায়নি তো? বেশ কয়েক বছর আমি গায়ে ফুঁ দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, মাঝে মাঝে টিউশানি করা ছাড়া আমার কোনো উপার্জন নেই। চাকরির জন্য একটা প্রতিনিয়ত চাপ অনুভব করছি বাড়ির দিক থেকে। অভাব তো আছেই।

কিন্তু দশটা পাঁচটার জাঁতা কলে কিছুতেই আমার ইচ্ছে হয় না শরীরেরতেল

পিষতে। অথচ পালিয়ে পালিয়েই বা কতদিন বেড়াবো? আমি বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে সন্ন্যাসী হয়েও চলে যেতে পারবো না, পারিবারিক জীবনের ওপরে আমার বড় মায়া। সকালবেলা দেরি করে ঘুম ভাঙার জন্য মা বকুনি দিতে দিতেই গরম চায়ের কাপ এগিয়ে দিল, এটাও যে কত মধুর।

বাড়িতে যদি জানতে পারে যে আমি হলদিয়ায় একটা চাকরির জন্য সিলেকটেড হয়ে গেছি, তাহলে আত্মীয়স্বজন উঠে পড়ে লাগবে। সবাই চায় আমার একটা কিছু হিল্লে হোক। এমন সুযোগ হাতে পেয়েও কি কেউ ছেড়ে দেয়?.. একদম বসে থাকার চেয়ে কিছু একটা করাও ভালো। এর থেকে ভালো চান্স অন্য কোথাও পেলে এটা তখন ছেড়ে দিস, নীলু!..এই বাজারে চাকরি পাওয়াটাই একটা ভাগ্যের কথা, বুঝলি নীলু? অন্তত দুটো মাস করে দ্যাখ না, যদি মন লেগে যায়! শোন নীলু,আমি বলছি এতে তোর ভালোই হবে। হলদিয়াতে থাকলে তুই আরও ভালো জায়গায় সুযোগ পেয়ে যাবি, ওখানে কতরকম ইণ্ডাস্টি হচ্ছে, কত লোকের সঙ্গে চেনা হবে। আরে শোন, আমার বড় পিসেমশাই রেলে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনেতে ঢুকেছিলেন, রিটায়ার করলেন সাড়ে তিন হাজারে। আজকাল কত ভালো ভালো ছেলে হোটেল ম্যানেজমেন্টের ট্রেনিং নিচ্ছে। আমার মত যদি শুনিস ছোট কম্পানিতে বড় চাকরির চেয়ে বড় কম্পানিতে ছোট চাকরিও ভালো। পর পর প্রমোশন হয়ে যাবে ঠিক।

মামা-কাকা-দাদাদের উপদেশগুলো আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। আমার চোখ জ্বালা করছে। কেউ আমাকে আমার খুশী মতন বাঁচতে দেবে না। রফিক ভাগ্যবান। একমাত্র সেই অন্যের ইচ্ছের পরোয়া করে না।

অরিন্দম আর টিপু এসে বসলো আমার দুপাশে। টিপু বললো, কী রে তোর অভিমান হয়েছে, হঠাৎ পালিয়ে চলে এলি?

অরিন্দম বললো, ঠিক আছে, তোকে ক্যান্টিনের ম্যানেজারের চাকরি নিতে হবে না। তুই বেকারই থেকে যা। আমরা সবাই চাকরি পেয়ে গেলে তোর জন্য চাঁদা তুলে একটা ফাণ্ড করবো। তুই সারা ভারত বেকারশ্রী হবি।

খানিকবাদে ওরা দুজন ফিরে গেল লাইব্রেরিতে, আমি হাঁটতে লাগলুম চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে।

চোখটা জ্বালা জ্বালা করছে। সমস্ত পৃথিবীর ওপর একটা যেন প্রবল অভিমানের ভাব। বিকেলবেলার আকাশ মাথার ওপরে সমুদ হয়ে আছে। খাঁ খাঁ করছে শূন্য রেসকোর্স। রাস্তায় প্রায় একটাও মানুষ নেই কেন? এক একদিন সব কিছুই ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

ভিক্টোরিয়ার সামনে অবশ্য অনেক গাড়ি,প্রচুর লাল-নীল-হলুদ পোষাক। পাওভাজি ফুচকা, অলুকাবলির দোকানগুলি সরগরম। প্রত্যেকদিনই বিকেলের পর এই জায়গাটায় বেশ একটা অবাঙালী উৎসব মতন হয়।

পাঁচ ছটি যুবতী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রফিক। ফুচকা পর্ব চলছে। সেদিকে চোখ পড়া মাত্র আমি মুখটা ফিরিয়ে নিলুম।

রাস্তা পার হতে হতে শুনতে পেলুম রফিকের গলা, ঝাল হয়নি,আউর ঝাল লাগাও।

ঝাল খেতে পারে বটে রফিক। আমিও ঝালের ব্যাপারে কম যাই না। কিন্তু রফিক

একেবারে আগুন খেয়ে ফেলতে পারে। ওর সঙ্গের মেয়েরা খুব হাসছে। রক্ষণশীল বনেদী পরিবারের মেয়েরা আজ রফিকের অভিভাবকত্বে ময়দানে অ্যাডভেঞ্চারে এসেছে বোঝা যাচ্ছে।

এপারে আসতেই রফিকের বাড়ির ড্রাইভার আবদুলের সঙ্গে দেখা।

রফিকদের গাড়িতে আমি অনেক ঘুরেছি, তাই আবদুল আমায় চেনে। একখানা লম্বা সেলাম দিয়ে সে বললো, সাব উধার হায় আপ যাইয়ে।

আমি যে ওর সাহেবকে এড়াবার চেষ্টা করছি,তা তো বলা যায় না। ঘাড় ঘুরিয়ে এক পলক দেখে নিয়ে বললুম,ও, তোমার সাহেব এদিকে এসেছেন বুঝি? আচ্ছা। হামারা জরুরি কাম হায় আভি।

কিন্তু ঐ একবার ঘাড় ঘোরাতেই রফিক দেখে ফেলেছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলো, এই নীলু। নীলু। এদিকেচলে আয়।

ঐ মেয়েগুলির মধ্যে কি রোমি আছে? আমি যে রোমির সঙ্গে দেখা করতে চাই না। কে আর অকারণে বুক কাঁপাতে চায়?

চোখাচোখি যখন হয়েছে তখন আর রফিকের হাত ছাড়ানো যাবে না। রফিক আজ বেশ ফুর্তির মেজাজে আছে। শাদা ট্রাউজার্সের ওপরে একটা টকটকে লাল রঙের হাওয়াই শার্ট পরেছে। সঙ্গের পাঁচজন যুবতীর মধ্যে দুজন পরেছে শালওয়ার কামিজ, দুজন শাড়ি আর একজন জিনসের ওপর কুর্তা। শাড়ি পরা দুজনের মধ্যে একজন রোমি।

রফিক জিজ্ঞেস করলো, এদিকে কোথায় যাচ্ছিলি?

ফুচকাওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে বললুম, অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে। একটা ছবির এক্সিবিশান দেখতে।

–আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সায়েদা, মিতুন, তাহমিনা আর শর্মিষ্ঠা। রোমিকে তো তুই চিনিস।

প্রায় আকাশের দিকে চোখ তুলে নমস্কার করলুম। প্রত্যেকের গা থেকে ভালো ভালো পারফিউমের গন্ধ আসছে। এরা অনেক উচ্চস্তরের মহিলা। তাছাড়া একসঙ্গে এতগুলি সুন্দরী দেখলে আমার মুখ দিয়ে কথা ফোটে না।

রফিক বললো, মেয়েরা তোমরা এবার দ্যাখো, নীলুর সঙ্গে আমার কমপিটিশান হবে ঝাল খাওয়ার। ফুচকাওয়ালা লাগাও তোমার শুকনা মরিচ কত আছে।

আমি সঙ্কুচিতভাবে বললুম, নারে, আমি আজ খাবো না।

– কেন? হঠাৎ সাহেব হয়েছিস নাকি যে ফুচকা খাবি না?

–নারে, আজ ঠিক ইচ্ছে নেই।

– পেট খারাপ হয়েছে? বোকা জানিস না মেয়েদের সামনে ঐ কথা বলতে নেই। একটু আগে আমি তোর কথাই বলছিলুম। এরা আমার ঝাল খাওয়া দেখে অবাক হচ্ছিল, আমি বললুম তোমরা তো তাও নীলুর ঝাল খাওয়া দ্যাখোনি। মিতুন, বলিনি?

শালওয়ার কামিজ পরা একটি মেয়ে বললো, জী। ইনিই হঠাৎ এসে পড়লেন এখানে।

রফিক বললো, হঠাৎ নয়, তোমাদের মধ্যে একজনকে দেখতে পেয়ে ও এখানে ঘুর ঘুর করছিল। হা-হা-হা। নে নীলু পাতা নে।

যে মেয়েটির নাম শর্মিষ্ঠা সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি নিয়মিত আর্ট এক্সিবিশান দেখতে যান?

–নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে।

–আমার এক দাদা ছবি আঁকেন। এখন ফ্রান্সে আছেন। আপনি হয়তো নাম শুনলে চিনবেন।

নামটি শুনলুম, চিনতে পারলুম না, তবু বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই, উনি তো বেশ বিখ্যাত। ওঁর ছবি দেখেছি।

সমাজের একটা স্তরে এটাই নিয়ম। দেখিনি শুনিনি বা পড়িনি বলতে নেই কক্ষনো, তাহলেই তুমি ছোট হয়ে গেলে। তোমাকে সব সময় প্রমাণ করতে হবে তুমি আপ টু ডেট।

শর্মিষ্ঠা আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি নিজেও বুঝি আঁকেন?

আমার উত্তরের আগেই রফিক বললো, হ্যাঁ, নীলু খুব ভালো আঁকে। প্রচুর ছবি এঁকে এঁকে ফেলে দেয়। একদিন ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি কি জানো, নিজের আঁকা ছবি ছাদ থেকে উড়িয়ে দিচ্ছে। হা-হা-হা-।

রফিকের হাসির কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। একদিন দারুণ গম্ভীর, আবার এক একদিন ওকে যেন হাসিতে পেয়ে বসে। আমি একটা সোজা দাগ পর্যন্ত টানতে জানি না, অথচ আমাকে আর্টিস্ট বানাবার যে ওর কী উদ্দেশ্য কে জানে।

রফিক বললো, এখানে আর একজন আর্টিস্ট আছে। নীলু তুই জানিস, রোমি ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকে। ওয়াটার কালারে ওর দারুণ হাত ছিল।

সেই দু-এক পলক ছাড়া আমি আর রোমির দিকে তাকাইনি। এবারে আবার চোখাচোখি হলো। আজ আর সাদা সিল্ক নয়। একটা মেরুন রঙের শাড়ি পরেছে, রোমি, গলায় কিছু একটা পাথরের মালা। আমি হীরে-মুক্তো ঝুটো গয়না কিছুই চিনি না।

ছবি আঁকা বিষয়ে রোমি ভদ্রতা করেও কোনো প্রতিবাদ জানালো না।

মিতুন মেয়েটিই এখানে সবচেয়ে বয়েসে ছোট, আঠেরো-উনিশ হবে। সে বল-লো, রফিকভাই তুমি আর খেয়ো না, করছো কী? তোমার বন্ধু তো হেরে গেছে।

আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, হ্যাঁ, আমি হেরে গেছি।

রফিক হাতের পাতাটা ফেলে দিয়ে বললো, ধুৎ, আজকাল মরিচে সেরকম ঝালই নেই। নীলু তুই এক কাজ কর, তুই একাডেমিতে যাচ্ছিস তো, রোমিকে সঙ্গে নিয়ে যা। ও ছবি ভালোবাসে, ও দেখে আসুক। আমরা ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসছি ততক্ষণ।

আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি আর রোমি আলাদা চলে যাবো? এ কখনো সম্ভব? রোমি আর আমি পাশাপাশি হাঁটবো? ও আমার সঙ্গে কথা বলবে!

রোমি কোনো আপত্তি করছে না তো।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর শর্মিষ্ঠা বললো', আমরা সবাই মিলেই তো যেতে পারি। কাছেই তো।

রফিক বললো, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।

মিতুন বললো, আর দেরি করা যাবে না। আমাদের এবার তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। রোমি আবার আমাদের বাড়িতে যাবার নাম করে এসেছে, শেষে যদি ওর খোঁজ করে।

তাহমিনা বললো, আমিও দেরি করতে পারবো না।

শর্মিষ্ঠা বললো, এত তাড়াতাড়ি ফিরবে? এখনো তো সন্ধেই হয়নি।

মিতুন বললো, না ভাই দেরি করলে বাড়িতে আবার মুস্কিল আছে।

রোমি বললো, আমি কোনোদিন এখানে মাঠে বসিনি। আজ একটু বসি? দশ মিনিট? আকাশটা বড় সুন্দর হয়েছে।

আমার মনে মনে একটা আশঙ্কা ছিল রোমি বোধহয় ভালো বাংলা জানে না। হয়তো ওরা উর্দুভাষী। এই প্রথম সামনাসামনি রোমির কথা শুনলুম আমি। ওর উচ্চারণে কোনো টান নেই।

ফুচকাওয়ালাকে দাম চুকিয়ে দিয়ে মাঠের দিকে এগোতে এগোতে রফিক বললো, রোমি যে ছবি আঁকতো, তাতে ওর বাবার খুব আপত্তি ছিল। উনি এসব পছন্দ করেন না। তারপর রোমি কী করলো জানিস? ছবি আঁকা ছেড়ে মূর্তি গড়তে আরম্ভ করলো। মাটি দিয়ে এত বড় বড় সব পুতুল বানিয়েছে। তাতে ওর বাবা তো মহা খাপ্পা। মূর্তি গড়া তো স্যাক্রিলেজ। ভেঙ্গে ফেললেন পুতুলগুলো।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কেন, ছবি আঁকা, মূর্তি গড়ায় এত আপত্তি কিসের?

–তুই বুঝবি না। তুই হিন্দু বাড়ির ছেলে। রোমি কিন্তু দারুণ তেজী। বাড়ির লোকের কথায় প্রায়ই রিভোল্ট করে। এর পরেও আবার মূর্তি গড়েছে। হিউম্যান ফিগার। একটা তো বেশ বড়।

তাহমিনা বললো, মাটি কাদা দিয়ে মূর্তি গড়লে হাতের আঙুল খারাপ হয়ে যায়।

রফিক তাকে এক ধমক দিয়ে বললো, তুমি চুপ করো।

তারপর আমাকে আবার বললো, তোকে বলেছিলুম না, রোমি একবার রাত্তিরবেলা ট্রেনে থেকে একটা স্টেশনে নেমে গিয়েছিল? গত সপ্তাহে ও আবার কী করেছে জানিস?

রোমি অনুরোধের সুরে বললো, রফিকভাই ওটা থাক, ওটা বলো না, প্লিজ।

রফিক হা–হা করে হেসে উঠলো।

ওরা বসতে যাচ্ছে, আমি বললুম, চলি।

একদিনে এতখানিই যথেষ্ট। এর বেশি লোভ করা ভালো নয়। রফিক কয়েকটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে, তাদের সঙ্গে আমার কি আঠার মতন লেগে থাকা উচিত? রোমিকে আজ আমি যতটা সময় ধরে দেখেছি, তাতে আর এক বছর না দেখলেও চলবে।

রফিক আমার হাত ধরে বললো, কোথায় যাচ্ছিস? বোস একটু আমাদের সঙ্গে–

–না রে, একাডেমিতে আমার জন্য দুজন অপেক্ষা করবে।

–দুজন? একজন নয় তো। তবে যা। শোন, আমার জন্য ফ্ল্যাট খুঁজছিস তো? আমি সিরিয়াস।

–হ্যাঁ, দেখছি।

–যা বলেছি মনে রাখিস। আমি কথায় খেলাপ করি না।

অ্যাকাডেমিতে আমার জন্য কেউ দাঁড়িয়ে থাকবে না। এই বর্ষায় সেখানে কোন ভালো প্রদর্শনী থাকার সম্ভাবনাও খুব কম। তবু আমি সেদিকেই হাঁটতে লাগলুম।

শর্মিষ্ঠা নামের মেয়েটি যদি সবাই মিলে আসার প্রস্তাব না দিত, তাহলে রোমি একলা আসতো আমার সঙ্গে? এই রাস্তা দিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যেতুম! রোমি শুধু রূপসী নয়, সে একজন শিল্পী। ঐ জন্যই ওর চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। কী রকম যেন গাঢ়ভাবে তাকায়। রোমি বিদ্রোহিনী। মাঝরাতে একলা একটা অজানা স্টেশনে নেমে পড়েছিল...! কী করেছিল গত সপ্তাহে?

এরপর সারা সন্ধে রোমিকে নিয়েই কাটলো। নাইট শো–তে দেখতে গেলুম, একটা ফিল্ম। যত দেরি করে বাড়ি ফেরা যায়। চাকরির কথাটা তুলতেই দেবো না। টাকার দরকার তো? ঠিক আছে আমি টাকা বানাবো। মানব জমিন পতিত থাকবে না। আবাদ করলেই সোনা ফলবে। আমার হাতে কলম আছে, সাদা কাগজই আমার কৃষিক্ষেত্র।

পরদিনটাও বেশ ভালো ভাবেই কাটলো, কিন্তু মেজাজ খারাপ হয়ে গেল রাত্তিরে বাড়ি ফিরে।

লোডশেডিং। বাড়ি ফিরে অভ্যেসবশত দরজার পাশের ডাক বাক্সটা একবার খুলে দেখি। হাতে ঠেকলো একটা খাম। অন্ধকারে পড়া যাবে না।

দু'তিনটে সিঁড়ি টপকে উঠে এলুম ওপরে।

দরজা খুলেই মা বললেন, সারাদিন কোথায় থাকসি? আজ চম্পক এসে তোর জন্য অনেকক্ষণ বসে ছিল। বললো, খুব জরুরি দরকার আছে।

শুভ্রবসনা মা হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে, পটভূমিকায় শুধু অন্ধকার। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু এই মুহূর্তে মাকে দেখে আমার রীতিমতন ভয় করতে লাগলো।

মা নিশ্চয়ই চম্পককে যত্ন করেছে অনেক, ডিম ভাজা আর চা খাইয়েছে। আর চম্পক গড়গড় করে বলে গেছে সব কথা।

মায়ের মুখে যে হাসি ফুটলো সেটাও আমার মনো হলো অতি নিষ্ঠুর হাসি। যেন নিজের জননী অন্যের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমায় জেলে পাঠাচ্ছে।

–নীলু, তোর নাকি চাকরি হয়ে গেছে, তুই আমাদের বলিসনি।

মোমের আলোয় আমি খামখানা দেখলুম। তাতে আমারই নাম লেখা। না, এটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নয়। সুদৃশ্য চৌকো গোলাপি রঙের খাম, ওপরে কোনো ডাক টিকিট নেই। কে দিয়ে গেল এই রহস্যময় চিঠি? এরকম চিঠি মায়ের সামনে খোলা যায় না।

–হাত পা ধুয়ে নে, আমি ততক্ষণ খাবার গরম করি। খেতে খেতে সব বলিস।

–না, শোনো, এখনই বলছি।

–বাইরে যেতে হবে? চম্পক বললো, মাইনে নাকি বেশ ভালো। খাওয়া থাকার খরচ লাগবে না।

–মা, চম্পক আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা আমি নেবো না।

–নিবি না? কেন?

মায়ের কণ্ঠের আর্ত হাহাকার আমি বেশ উপভোগ করলুম। অনেক সময় মা আর সন্তানের মধ্যেও হৃদয়হীন খেলা চলতে পারে। আরও খানিকক্ষণ মাকে বিস্মিত দুশ্চিন্তায় রেখে আমি জামার বোতাম খুলতে লাগলুম।

– আমার খুব একটা অনিচ্ছে ছিল না, আমি নিতে রাজীই ছিলুম, শুধু তোমাদের কথা ভেবেই ও চাকরিটা নিচ্ছি না।

–তুই কী বলছিস নীলু, কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের কথা ভেবেই তুই চাকরি নিচ্ছিস না!

–হ্যাঁ ঠিক তাই। আমি যদি সংসারে একা হতুম গ্রাহ্য করতুম না, একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে ওটাই নিতুম। এমনিতে তো চাকরিটা সত্যিই খুব ভালো।

মা চেয়ারের ওপর বসে পড়লো আমি তার হাত থেকে মোমবাতিটা নিয়ে টেবিলে বসালুম। –শোনো মা, ব্যাপারটা তোমায় খুলে বলছি। আমি কোনো চাকরির দরখাস্ত করিনি। চম্পকের সঙ্গে এমনিই হলদিয়ায় গেছি। সেখানে চম্পক আমার জন্য সামান্য একটু চেষ্টা করতেই আমার জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেল। নিজস্ব কোয়ার্টার, খাওয়ার খরচ নেই, মাইনেও হাজার টাকার ওপর। আজকালকার দিনে এরকম চাকরি মানে তো স্বর্গ, তাই না!

–চম্পক তো সেই কথাই বললো।

চম্পক তোমায় সবটা বলেনি। এরকম চাকরি এত সহজে কেউ পায়? চম্পক নিজেও তো চাকরি খুঁজছে অনেকদিন ধরে, ও নিজে নিল না কেন?

–ও তোর ভালো চায়। ওদের বাড়ির অবস্থাও তো বেশ ভালো শুনেছি।

–তোমার তাহলে ইচ্ছে আমিই ঐ চাকরিটা নিই? এখনো পুরো না বলে দিইনি। অ্যাক্সেপ্ট করতে পারি।

–তুই নিতে চাইছিস না কেন, সেটাই তো বুঝছি না।

–তুমি কান্নাকাটি করবে সেই জন্য। নইলে আমার আর কী?

–আমি কান্নাকাটি করবো? কেন, কত দূরে? চম্পক যে বললো হলদিয়ায়।

হ্যাঁ, বেশি দূর নয়। একবেলাতেই যাওয়া যায়। আমার কিছু একটা হলে তোমরা চট করে খবর পেয়ে যাবে।

–অ্যাঁ?

–যে পোস্টে ওরা আমাকে নিচ্ছে, সেই পোস্টে গত পাঁচ মাসের মধ্যে দুজন খুন হয়েছে। ওখানে কিছু একটা র‍্যাকেট আছে, ওরা কিছুতেই বাইরের লোককে ঐ কাজ করতে দেবে না।

–খুন হয়েছে?

–হ্যাঁ, দুজনেই কলকাতার ছেলে। এখন ঐ পোস্টে কেউ যেতে চায় না। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে রাজি ছিলুম মা। আমাদের পয়সাকড়ির অভাব।

–চম্পক কী অদ্ভুত ছেলে, এসব কথা একবারও আমাকে বললো না। জেনে শুনে তোকে ওখানে পাঠাতে চাইছে। নীলু....

হঠাৎ মা থেমে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর উঠে এসে আমার পিঠে হাত বুলোতে লাগলো একটুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় বললো, নীলু,

টাকার জন্য কি মানুষকে পাপ কাজ করতে হবে? যে চাকরি করতে গেলে মানুষ খুন হয়, সে চাকরিতে নিশ্চয়ই পাপ আছে। ছি ছি ছি ছি। আহা রে, যে ছেলেদুটোর প্রাণ গেছে, তাদের মায়েদের কী অবস্থা! ছি ছি ছি ছি। মা বুকে টেনে নিল আমাকে।

এতবড় ধেড়ে ছেলে হয়েও আমি মায়ের আদর ভোগ করতে লাগলুম। প্রথম থেকেই যদি সত্যি কথা বলতুম, তাহলে মা কি আমায় এরকম আদর করতো? একটা রাগ রাগ ভাব, অভিমান, টেনশান এই সব চলতো কয়েকদিন। পৃথিবীতে এখন অনেক কিছুরই মূল্য বদলে গেছে।

এখন খাবার গরম ইত্যাদি জন্য মিনিট পনেরো সময় পাওয়া যাবে। আমি একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে চলে এলুম নিজের ঘরে। পাশের ঘরে দাদা ব্যাটারির আলোতে বই পড়ছে।

অতি সামান্য চেষ্টাতেই মাকে বশীভূত করে যে আনন্দটা হয়েছিল, সেটা মুহূর্তে উবে গেল চিঠিটা পড়ে। রাগে জ্বলতে লাগলো মাথা।

সেটা কোনো চিঠিই নয়। কোনো সম্বোধন নেই। শুধু এই কটি কথা লেখা আছেঃ

রোমির ঠিকানা

১৩এ পার্ল স্ট্রিট, বেকবাগান।

ফোন নং ৪৮–২৩৫৭

দুপুরবেলা ও বাড়িতে কোনো পুরুষ অভিভাবক থাকে না।

রোমি একদিন ছবি ও পুতুল দেখাতে চায়। হাতের লেখাটা অচেনা। কিন্তু এটা যে রফিকেরই কীর্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি অক্ষরে যেন আমি রফিকের হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। এরা ভেবেছে কী?

এক বন্ধু আমাকে চাকরি পাইয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত। আর এক বন্ধু জোর করে আমাকে একটি মেয়ের প্রেমে পড়াতে চায়। আমি কি ওদের দয়ার পাত্র?

রোমিকে আমার ভালো লেগেছিল, কিন্তু এর মাঝখানে রফিকের এত বেশি সাহায্য করার চেষ্টা বিষয়টাকে তেতো করে দিচ্ছে।

রোমি আর হলদিয়ার চাকরি যেন এক হয়ে গেল।

রাগের মধ্যেও আমার একটু একটু হাসি পেল। রোমিকে আমি মনে মনে মারুমাড়ের নির্জন, সুশ্রী ডাকবাংলোর সঙ্গে তুলনা করেছিলুম। তার বদলে সে এখন হলদিয়ার একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর, হৈ-হট্টগোলে ভরা গেস্ট হাউসের সমান হয়ে গেল।

এই ধরনের বাস্তব আমার সহ্য হয় না। এবার আমাকে এই সব বন্ধুবেশী শত্রুদের থেকে দূরে পালাতে হবে।

।। সাত ।

একদিন একজন আমাকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল।

বাবার গুণেন কাকা, আমরাও তাঁকে কাকা বলতুম। তিনি দাদু ডাকটা পছন্দ করতেন না। তখন তাঁর অনেক বয়স, এককালে জেলটেল খেটেছিলেন, তারপর বনগাঁ–র দিকে কোন্ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতায়।

আমি তখন সদ্য কলেজে ভর্তি হয়েছি। গুণেনকাকা বেশ রসিক ছিলেন। আমাকে

জিজ্ঞেস করেছিলেন, বল্ দেখি বাবা, কোন লোকের সঙ্গে প্রত্যেকদিন সকালে আমাদের দেখা হয়, অথচ আমরা তার নাম জানি না?

আমি একটু ভেবে বলেছিলুম, খবরের কাগজের হকার।

গুণেনকাকা হেসে বলেছিলেন, তুই খুব ভোরে উঠিস বুঝি? খবরের কাগজের হকারের সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা হয়?

বুঝলুম ভুল বলেছি। খবরের হকার অত্যন্ত দুর্লভ প্রাণী। মাসের মধ্যে একদিনও তাকে ধরা অতি কঠিন কাজ। তাছাড়া আমাদরে দোতলায় সে কাগজ দিয়ে যায় রাস্তা থেকে ছুঁড়ে, তার মুখ আমি কোনোদিন দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। নাম জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

গুণেনকাকার ধাঁধার উত্তরটি হচ্ছে ধাঙড়। সে প্রত্যেকদিন বাড়ির মধ্যে আসে, বাথরুম পরিষ্কার করে, তার মুখ চিনি, কিন্তু তার নাম জানি না।

গুণেনকাকা বলেছিলেন, সপ্তাহে একদিন যে ধোপা আসে বাড়িতে, ক'জন তার নাম জানে? যে মুচি নিয়মিত জুতো সারায়, যে মাছওয়ালার কাছ থেকে নিয়মিত মাছ কিনি, আমরা তার নাম জানার কোনো আগ্রহই বোধ করি না। এই জন্যই মানুষে মানুষে যোগাযোগ আজকাল এত কমে গেছে। আগেকার দিনে লোকে যে গয়লা দুধ দিত তারও বাড়ির খবর, কটি ছেলেমেয়ে, তার বিবাহিতা মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে সুখে আছে কিনা সে খবরও রাখতো। নতুন কেউ ভিক্ষে চাইতে এলেও জিজ্ঞেস করা হতো, বাপের নাম কী, বাড়ি কোথায় ছিল? তার ফলে মানুষে মানুষে সুখ-দুঃখের অংশীদার হতো। ইংরেজদের প্রভাবে আমরা সে-সব ভুলে গেছি। সহসা কেউ কারুর নাম-ধাম জানতে চাই না।

গুণেনকাকা আমাকে কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, তখন সে শিক্ষা আমি গ্রহণ করিনি। জীবনের অনেক ক্ষেত্রে নানান মানুষের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয়, তাদের নাম-ধাম কিছুই জানি না।

পরদিন বাজারে গিয়ে সেই কথাই মনে পড়লো। ডিমওয়ালী বুড়ির নাম কী? কোথায় তার বাড়ি? সে একদিন তার বাড়িতে যেতে আমায় অনুরোধ করেছিল, আমি ওটা কথার কথা ভেবে তার বাড়ির কথা জানতেও চাইনি।

হিলহিলে চেহারার কিশোরীটি আজ ঝিঙে নিয়ে বসেছে। ওর কাছ থেকে এক কিলো ঝিঙে কিনলুম। এক টাকা বারো আনা দাম, দু' টাকার নোটের চার আনা সে ফেরৎ দিতে পারছে না বলে আমি বললুম, থাক না, পরের দিন এসে নিয়ে নেবো।

তারপর জিজ্ঞেস করলুম, তোমার পাশে যে বুড়ি বসতো, কী হলো তার? সে আর আসে না!

কিশোরীটি ঠোঁট উল্টে বললো, কী জানি!

-বাঃ, তোমার পাশে রোজ বসতো, এখন আর আসে না, তার কোনো খবর নাওনি? সে কোথায় থাকে, জানো?

কিশোরীটি উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদের বোধহয় নিয়মকানুন আলাদা। যাকে বলে 'জীবন সংগ্রাম'। তাই নিয়ে প্রত্যেকদিন যারা ব্যস্ত তারা হয়তো কে এলো কে গেল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

অন্য পাশের প্রৌঢ়টি বললো, ও বুড়ি থাকে সেনারপুরে। অসুখ-বিসুখ করেছে বোধ করি।

কিশোরী মেয়েটি তাকে ধমক দিয়ে বললো, তুমি ছাই জানো! বুড়ি থাকে কাদাগোলায়, আমাদের পাশের গাঁ। সোনারপুর থেকে আরও দুই কোরোস।

আমি কিশোরীটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার নাম কী?

সে লজ্জায় এদিক ওদিক মাথা দোলাতে লাগলো। এটা আমিও লক্ষ করেছি যে গ্রামের ছেলেমেয়েরা নাম জিজ্ঞেস করলে খুব লজ্জা পায়।

একটু বাদে সে বললো, ময়না। একটা ভালো নাম আছে, নাজমা। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমর নাম কী?

সে বললো, তার নাম খগো।

নাম দুটো মনে রাখতে হবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ! আজ মাছওয়ালা, আলুওয়ালা, নারকোলওয়ালী সবার নাম জেনে নেবো।

এরপর মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলুম, ঐ যে বুড়ি ডিম বিক্রি করতো, ওর নাম কী?

দেখা গেল ইংরেজি সভ্যতার প্রভাব এই সবজী বিক্রেতাদের ওপরেও পড়েছে। কিশোরী মেয়েটি বা প্রৌঢ়টি কেউই ঐ ডিমওয়ালী বুড়ির নাম জানে না। অথচ কতদিন সে ওদের মাঝখানে বসেছে। দু'জনেই তাকে ডাকতো দিদিমা বলে।

কিশোরীটির কাছে আমি জানতে চাইলুম, কাদাগোলা কীভাবে যেতে হয়?

সে তার টলটলে চোখ দুটি আমার দিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত তুলে রাখলো। তারপর বললো, আপনি কাদাগোলায় যাবেন? হি হি হি।

–কেন, যেতে পারি না? হাসছো কেন?

–হেঁটে যেতে হয় গো বাবু।

–তোমার কি ধারণা আমি হাঁটতে পারি না? গাঁয়ের মানুষই শুধু হাঁটতে পারে? চার মাইল আর এমনকি রাস্তা।

–গাঁয়ের নাম যে কাদাগোলা। এঁটেল মাটি, হি হি হি। এই বর্ষার সময় একেবারে থকথকে দই। হি হি হি। দেখুন গে, দিদিমা বোধ হয় ঐ রাস্তার জন্যই আসতে পারছে না।

পৌঢ় দোকানীটি পোড় খাওয়া সংসারী মানুষ। সে বললো, বাবুর কিছু টাকা পাওনা আছে, লয়? একদিন একটা বিশ টাকার নোট দিয়ে ভাংতি ল্যাননি।

একথা ঠিক নয়, বুড়ির কাছে আমার এক পয়সাও পাওনা নেই। বরং সে একদিন আমায় বিনা পয়সায় একটা ডিম দিয়েছিল। আমি যে বুড়ির কাছে কেন যেতে চাইছি তা এই লোকটিকে বোঝানো যাবে না, অন্তত আমার ভাষায়।

খগো আবার বললো, বুইঝলেন বাবু, ও বুড়ি প্রায়ই ওর এক লাতির কথা বলতো। খুব পেয়ারের লাতি। সে ছোঁড়া সোনারপুর এস্টেশানে পান-বিড়ি ফিরি করে।

এটা একটা দরকারী সংবাদ। সোনারপুর স্টেশনে যে-পান-বিড়ি বিক্রি করে তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ।

ময়না বললো, সে লোকটা তো একবার জেল খেটেছিল, ও দিদিমার আপন নাতি নয় গো! পাড়াতুতো!

খগো বললো, তা হতি পারে। যা শুনিছি তাই বলিছি। বাবু জানতে চাইলেন।

ময়নার কাছে অন্য খদ্দের এসে গেছে, তাই সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওর ঝিঙেগুলো বেশ টাটকা, উড়ে যেতে বেশি সময় লাগবে না।

সেই খদ্দেরটি চলে যেতে আমি ময়নাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই ঝিঙে তোমাদের নিজেদের খেতের বুঝি?

ময়না ফিক করে হেসে খগোর দিকে ফিরে বললো, পোড়া কপাল। বাবুটা কিচ্ছু বোঝে না। আমাদের আবার খেতি জমি আছে নাকি। একখানা মাত্তর ঘর সম্বল।

খগো মাথা নাড়লো। সে বাবুশ্রেণীর অজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেও হাসে।

আমি তবু জিজ্ঞেস করলুম, তা হলে এ ঝিঙে কোথা থেকে আনলে?

–হাট ঠেঙে। কাল বিকেলে হাট ছিল না?

–হাট থেকে তুমি নিজেই জিনিস কেনো?

–তবে আবার কে কিনবে? হি–হি–হি।

–বাড়িতে তোমার কে কে আছে?

–কেউ নেই, যাও, তোমার তো কেনা হয়ে গ্যাচে, এখন দোকানের সামনে থেকে সরে দাঁড়াও তো।

গুণেন কাকা যাই বলুন, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ এখন আর তেমন সহজ নয়। এ মেয়েটি আমার বেশি প্রশ্ন পছন্দ করছে না।

ময়না সবেমাত্র উদ্ভিন্নযৌবনা। কেউ আবার অন্যরকম সন্দেহও করতে পারে। খগো সেইরকম চোখেই চাইছে আমার দিকে। ডিমওয়ালী দিদিমার সঙ্গে আমার কীরকম ভাব ছিল তা এরা জানে, তবু তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এরা এত অস্বাভাবিক মন করছে কেন?

অলস পায়ে আমি এগিয়ে গেলুম মূল বাজারে দিকে।

ঘন্টাখানেক বাদে বাজারের থলি বাড়িতে পৌছে দিয়ে এসে আমি বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরলুম সোনারপুরের।

সোনারপুর নামটা বড় বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়? কে এই নাম রেখেছিল? কী আছে সোনারপুরে? কোনোদিন তো সোনারপুরের বিশেষ কোনো গৌরবের কথা শুনিনি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা জংশন স্টেশন। বারুইপুরে বা ক্যানিং যাবার পথে কয়েকবার এই স্টেশানটা দেখেছি, কোনোদিন ওখানে নামা হয়নি।

পৌছোতে বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম।

নিজেকে বেশ একটা শখের গোয়েন্দার মতন লাগছে। এক বুড়ির সন্ধানে এসেছি, যার আমি নাম জানি না। বুড়রি এক নাতি পান–বিড়ি ফেরি করে এখানে, তারও নাম জানি না, চেহারা জানি না। সে নাকি একবার জেল খেটেছে। যদি বা সেই নাতিকে খুঁজে পাই, তারপর সেই নাতি যদি উল্টে আমায় জিজ্ঞেস করে, আমার দিদিমাকে আপনি কেন খুঁজছেন, তাহলে তারও কোনো বিশ্বাসযোগ্য উত্তর দিতে পারবো না আমি।

একটা ক্যামেরা আনলে মন্দ হতো না। তাহলে বলা যেত ঠিক ঐরকম একটা বুড়ির মুখ আমাদের দরকার। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির জন্য দ্বিতীয় এক ইন্দির ঠাকরুন খুঁজছেন। সত্যজিৎ রায়ের নাম হয়তো এখানে অনেকেই শোনেনি, তবু যদি

বলা যায় যে সিনেমার জন্য একজন বেশ ভালো মতন বুড়ি চাই, তাহলে এখানকার লোক নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করার জন্য চাঙ্গা হয়ে উঠতো।

ট্রেনটা ছেড়ে যাবার পর আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের ভিড় পাতলা হলো। গোটা তিনেক চা-ওয়ালাকে দেখতে পাচ্ছি, একজনও পান-বিড়িওয়ালা চোখে পড়লো না। প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে একটা পাকা মনোহারী দোকান আছে, সেখানে পান-সিগারেট পাওয়া যায়। এই দোকানদারই কি বুড়ির নাতি?

কিন্তু এতবড় দোকানের যে মালিক, তার দিদিমা কেন বাজারে ক'টা ডিম বিক্রি করতে যাবে রোজ? অবশ্য বলা যায় না, অনেক ছেলে আজকাল নিজের বুড়ো বাপ-মাকেই দেখে না, ঠাকুমা-দিদিমা তো কোন্ ছার।

খগো বলেছিল, সেই পান-বিড়িওয়ালা ঐ বুড়ির খুব পেয়ারের নাতি। তাতেও কিছু প্রমাণ হয় না। কুপুত্রকেও মা ভালোবাসে, কুনাতিকেও ঠাকুমা-দিদিমারা অগাধ প্রশ্রয় দেয়।

দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। পকেটে সিগারেট আছে, এই দোকানে আমার কেনার মতন আর কিছু নেই।

এক কাপ চা খাওয়া যেতে পারে।

যতদূর সম্ভব দেরি করে তারিয়ে তারিয়ে চা-টা খেতে লাগলুম। নানান লোকজন আসছে, তাদের কথাবার্তা শুনছি। কেউ কাদাগোলা গ্রামের নাম করছে কিনা সেই সম্পর্কেই আমার বেশি কৌতূহল।

একজন লোক দোকানদারকে ডেকে বললো, অ বিষ্টুদা শোনো। কালকের ব্যাপারটার কিছু ফয়সলা হলো? আমি কিন্তু ছাড়বো না বলে দিচ্ছি।

দোকানদার যে-হেতু উঁচু জায়গায় বসে আছে তাই তার কণ্ঠস্বরে বেশ গাম্ভীর্য। লোকটির বয়স বছর পঁয়তিরিশের হবে, মুখে তিন-চারদিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

সে বললো, আমি কী জানি, তোর যা ইচ্ছে করগে যা।

–তুমি মাথা গলালে, নইলে কালই আমি ওকে ছাড়তুম না।

–আমি কী মাথা গলিয়েছি, অ্যাঁ। ওসব হেঁড়ো ঝামেলায় আমার কি দরকার?

–তুমি শালাকে প্রোটেকশান দিলে, আর এখন বলছো ... কথা থামিয়ে লোকটি আমার দিকে আড় চোখ তাকালে। ওরা কোনো গূঢ় বিষয়ে আলোচনা করছে, যা বাইরের লোকের শোনবার কথা নয়। অনেক রেল স্টেশনেই এমন অনেক কান্ড হয় যার সঙ্গে ট্রেন চলাচলের কোনো সম্পর্কই নেই।

চায়ের কাপটি নামিয়ে আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লুম।

দোকানদারের নাম বিষ্টু, অর্থাৎ বিষ্ণু। কোনো মুসলমানের এরকম নাম হতেই পারে না। ডাকনামও না। এ কী করে বুড়ির নাতি হবে?

অবশ্য ময়না বলেছিল সোনারপুরের লোকটি বুড়ির পালিত নাতি। বুড়ি তো একটি হিন্দুর ছেলেকেও নাতি হিসেবে পালন করতে পারে। বুড়ি তো আমাকেও নাতির মতনই ভালোবেসেছিল।

এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে পড়লো। বাজারে এত লোক আসে, তার মধ্যে বেছে বেছে শুধু আমার ওপরেই বুড়ির এত স্নেহ ছিল কেন? তার একটা কারণ এই হতে পারে যে বুড়ির নিজের নাতির সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে। আমাকে দেখে

তার কথা মনে পড়ে যেত।

হ্যাঁ, এটাই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। সোনারপুর স্টেশানে ঠিক আমার মতন চেহরার একটি ছেলেকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু আমার নিজের চেহারাটা কী রকম তা কি আমি সঠিক জানি? আয়নায় যাকে দেখি সে কি হুবহু আমার নিজের ছবি, নাকি তার মধ্যেও খানিকটা ইচ্ছাপূরণ থাকে।

সে যাই হোক, ঐ দোকানদারটিকে অনায়াসেই খারিজ করে দেওয়া যায়। এরকম চৌকো চেয়াল আমাদের চোদ্দ পুরুষের কারুর নয়।

ঝমঝম করে এসে পড়লো আর একটা ট্রেন। অমনি জায়গাটা মাছের গন্ধে ভরে গেল। ট্রেনটা ক্যানিং থেকে আসছে। এই স্টেশানে বেশ অনেক লোক ওঠে নামে।

একটা বেঞ্চ দেখে আমি বসলুম। পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। আশা করে এসেছিলুম, সোনারপুরে একটিমাত্র পান-বিড়িওয়ালার দেখা পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে কায়দা করে কথা বলে অনেক খবর বার করে নেবো। এমনকি তাকে কী কী প্রশ্ন করবো তাও ঠিক করা ছিল।

আরও একটা ট্রেন এলো, গেলো। কিন্তু আমি স্ট্যাটেজি ঠিক করতে পারছি না। প্রায় এক ঘন্টা সময় পার হয়ে গেছে। এক একবার মনে হচ্ছে, বুড়ির সন্ধান আজকের মতন ছেড়ে ক্যানিং বেড়াতে চলে গেলে কেমন হয়? সে[illegible] থেকে লঞ্চে চেপে সুন্দরবন।

ময়লা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা রোগা মতন একটি ছোকরা এসে বসলো আমার পাশে। পকেট থেকে একটি চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া সিগারেট বার করে সে জিজ্ঞেস করলো, দাদা দেশলাই আছে?

আমার কাছে আছে রফিকের দেওয়া একটি লাইটার। সেটা আমি হাতছাড়া করতে চাই না বলে ঝুঁকে পড়ে ছোকরাটির সিগারেট ধরিয়ে দিলুম।

গাঁজায় দম দেওয়ার মতন জোরে একটান মেরে আরাম করে ধোঁয়া ছাড়ার পর সে বললো, জমি দেখতে এসেছেন?

–কী?

–এদিকে জমি দেখতে এয়েছেন? আমার হাতে ভালো ভালো জমি আছে, এস্টেশান থেকে সাত মিনিট, পাকা রাস্তা। দরও সস্তা পড়বে।

প্রস্তাবটি শুনে আমার খুশী হবারই কথা। আমাকেও কেউ জমি কেনার যোগ্য লোক মনে করে।

আমার গোঁপ নেই, তাই ডানদিকের জুলপিটা ধরে পাক দিতে দিতে বললুম, হ্যাঁ, জমি কেনার কথা ভেবেছি বটে দু'একবার। আপনি জমি দেখাতে পারবেন?

লোকটি কাছে সরে এসে বললো, কেন পারবো না, কীরকম জমি চান বলুন? দুকাঠা, তিন কাটার প্লট? পুকুর-বাড়ি সমেত বড় জমিও আছে। সরকারদের একটা বাড়ি, দোতলা, সঙ্গে বাগান, সেটা বিক্কিরি আছে।

–কত দূরে?

–সাইকেল রিক্সায় গেলে ঠিক আপনার লাগবে আট মিনিট।

–এত কাছে আমার পছন্দ নয়। শহরের মধ্যে আমি জমি চাই না। কলকাতা শহরে তো বাড়ি আছেই। এদিকে বেশ একটা গ্রাম মতন জাগয়া চাই, গাছ-পালা থাকবে।

–বাগানবাড়ি চাইছেন?

–না, চাইছি গ্রামের মধ্যে খানিকটা জায়গা। এদিকে কাদাখোলা নামে একটা গ্রাম আছে না?

লোকটা বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে চেয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, কাদাখোলা?

আমি বললুম, ঐ নামে গ্রাম নেই কাছাকাছি?

–হ্যাঁ আছে, সে তো বেশ দূর।

–কত দূর? আমি তো শুনেছি মাইল পাঁচেক হবে।

–না না, কী বলেছেন, আট ন' মাইল তো হবেই। ওখানে যেয়ে কী করবেন দাদা? রাস্তাঘাট ভালো নেই, বাস চলে না।

–সাইকেল রিক্সা?

–এই বর্ষাকালে তাও যাবে না।

–তাহলে আর কী হবে। ঐ গ্রামটাই আমার পছন্দ।

–গ্রামের মধ্যে বাড়ি করতে চান তো? চলুন না, ভালো গ্রামে নিয়ে যাচ্ছি। আমবাগান পাবেন, কাছেই বাস রাস্তা, সাইকেল রিক্সা পাবেন রাত এগারোটা পর্যন্ত।

–যে গ্রামে বাস রাস্তা নেই, সেই রকম গ্রামই আমার চাই। সেখানে জমির দাম সস্তা।

–চলুন ঐ কাদাখোলাতেই নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

–এখন?

–হ্যাঁ, জমি দেখে বায়না করে আসবেন।

–আপনাকে কত দিতে হবে?

–যা খুশী হয় দেবেন। পথ খরচা হিসেবে বিশ পঁচিশ।

–পথ খরচা মানে? গাড়ি ভাড়া করতে হবে নাকি?

–না, আপনাকে আমি সর্টকাটে নিয়ে যাবো। বলছি আমার ডেইলি একটা খরচা আছে তো।

আমার মনের মধ্যে একটা অ্যালার্ম আছে। কোনো কোনো লোক দেখলে সেটা বেজে ওঠে। এখন আমি সেই ট-র-র ং শব্দটা শুনতে পাচ্ছি।

এই লোকটির চোখের মণি বেড়ালের মতন। দৃষ্টি চঞ্চল। ঘন ঘন হাঁটু দোলাচ্ছে। এই লোককে বিশ্বাস করা যায় না।

জমি দেখবার নাম করে নিরালায় নিয়ে গিয়ে এ আমার মাথায় ডান্ডা মারতে পারে।

আমার হাতে ঘড়ি, আংটি কিছু নেই। পকেটে মাত্র পঞ্চান্ন টাকা। কিন্তু প্যান্ট, শার্ট, জুতো কোনোটাই ছেঁড়া নয়। শুধু পরিষ্কার জামাকাপড়ই খুনেদের আকৃষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট।

আমি লোকটির চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে জিজ্ঞেস করলুম, আপনার নাম কী ভাই?

–আমার নাম? ইয়ে আমার নাম এককড়ি। এককড়ি সাপুই।

–বাড়ি কোথায়?

–বাড়ি এই সোরারপুরেই।

–কে কে আছে বাড়িতে?

–আছে মা, বাবা, দুটো ছোট ভাই। কই যাবেন তো উঠুন। বেলাবেলি ঘুরে আসা যাবে।

লোকটি নিজের নাম সত্যি বলেনি। আমার এতসব প্রশ্নও পছন্দ করছে না। আমাকে ও শহুরে বোকা বলে ধরে নিয়েছে।

–থাক, আজ আর যাবো না।

–কেন, চলুন আজ দুতিনটে জমি দেখাই। একবার দেখলেই তো পাকা হয় না।

–এদিকে জমি কেনার ইচ্ছে আমার আছে। তবে আমার মামা বারণ করছেন। আমার মামা বারাসত থানার ও সি। পঞ্চানন ঘোষাল, নাম শুনেছেন? মামা শিগগিরই সোনাপুর থানায় বদলি হয়ে আসছেন। মামা তাই বলছেন, আমি আগে যাই, তারপর ওদিকে তোর জন্য ভালো জমি দেখে দেবো। এখন সোনারপুর থানার যিনি ও সি, তাঁর সঙ্গেও আমার চেনা আছে। আমার মামার ওখানে তো কতবার নেমন্তন্ন খেতে গেছেন।

লোকটি শুকনো গলায় বললো, ও!

–মামা আসার পরই জমি দেখা ঠিক হবে না?

–তা তো বটেই!

–ঠিক আছে, তখন আপনার খোঁজ করবো, আপনিও সঙ্গে যাবেন। পুলিশের লোক হলেই যে গ্রামের সব খবর জানবে, তার তো কোনো মানে নেই। সে খবর আপনারাই ভাল জানবেন।

লোকটি দূরে কাকে যেন 'এই গুপী' বলে ডেকে সট করে উঠে চলে গেল। এর কাছে থেকে এইটুকুই তথ্য পেলুম যে কাদাখোলা গ্রামটি মাত্র চার–পাঁচ মাইল নয়, তার চেয়েও বেশি দূর। গ্রামের লোকের মাইলের হিসেবের ঠিক থাকে না।

আজ আকাশে মেঘ নেই, স্বচ্ছ দিন। এখানকার লোকজনদের কাছে খোঁজ নিয়ে আমি নিজেই কাদাখোলার দিকে রওনা দিতে পারি। কিন্তু তাতে খুব একটা উৎসাহ পাচ্ছি না। গ্রামে গিয়ে সেই ডিম–বেচা বুড়ির খোঁজ করবো কী করে? ঐ বয়েসের বুড়ি গ্রামে অনেক থাকে। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি গিয়ে উঁকি মারবো? আজকাল গ্রামের লোক বাইরের মানুষ দেখলেই সন্দেহ করে।

রেল স্টেশনে বা বাস ডিপোতে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়ার অভ্যেস আমার আছে। আমার ভাল লাগে, নিজেকে বেশ একা পাওয়া যায়। অনেক কথাবার্তা হয়।

আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো, নীললোহিত, ঐ বুড়ির সঙ্গে দেখা করার এত গরজ কেন তোমার?

–রোজার মাসে বুড়ির শরীর খারাপ হয়েছিল, তারপর আর আসছে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুড়ি হয়তো অসুস্থ, আর কোনোদিনই আসতে পারবে না। ও অনুরোধ করেছিল একবার ওর বাড়িতে যেতে।

–শুধু সেই জন্য?

–তাছাড়া, ঐ যে স্বপ্ন দেখলুম, সেইজন্য মনটা একটু খচ্ খচ্ করছে।

–মনে আছে দণ্ডকারণ্যের কথা?

–হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন?

–সেখানেও একজন বুড়ির সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল–কী যেন জায়গাটার নাম?

–জগদলপুর?

–উহুঁঃ!

–হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কোন্ডাগাঁও!

–সেখানে একটা বড় বাস স্টেশান, তুমি রাত্তিরে একটা হোটেলের বাইরের খাটিয়ায় বসে রুটি–মাংস খাচ্ছিলে...একজন বুড়ি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে এলো, তুমি ধমক দিয়ে বললে, দেখতা নেহি, হাত ঝুটা হ্যায়? কেইসে দেগা! বুড়ি বললো, একটু তাহলে ঘুরে আসি বাবা? তুমি তার মুখে বাংলা কথা শুনে খুব চমকে উঠলে।

–না খুব চমকাই নি। আগেও মধ্যপ্রদেশের সেই দুর্গম অঞ্চলে বেশ কয়েকজনের মুখে বাংলা কথা শুনেছি। দন্ডকারণ্যের রিফিউজি ক্যাম্প থেকে অনেক বাঙালী ছিটকে বাইরে চলে এসেছে।

তুমি বুড়িটাকে জিজ্ঞেস করলে, আগে কোথায় বাড়ি ছিল? সে বললে, ফরিদপুর। তারপর তুমি জিজ্ঞেস করলে, কোন্ গ্রাম? সে বললে–

জানি, জানি, কেন নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছো? সে আমার মামার বাড়ির গ্রামের এক নমঃশূদ্র। মামার বাড়িতেই সে কাজ করতো।

শুধু তাই নয়। যখন সে বললো, তাকে বোঁচার মা নামেই সবাই চিনতো, তখন তা শুনে তুমি বিচলিত হওনি? তোমার রোমাঞ্চ হয়নি সারা গায়ে?

হ্যাঁ, তা হয়েছিল। আমার মা–মাসীর কাছে ঐ বোঁচার মায়ের অনেক গল্প শুনেছি। উনি ধাই–এর কাজ করতেন। আমার জন্মের সময়ও উনি ধাই ছিলেন। ওর হাতেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছি।

তুমি তোমার মামাবাড়ির নাম করতেই বুড়ি একেবারে হেসেকেঁদে অস্থির। তুমি তোমার পরিচয় দাওনি। শুধু গ্রামটা চেনো শুনেই বুড়ির সে কি উত্তেজনা। তোমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। তখন তোমার কী মনে হয়েছিল?

মনে হয়েছিল যে অনেককাল পরে জন্মভূমির স্পর্শ পেলাম। আমি আবেগপ্রবণ, একটুতেই কাতর হয়ে পড়ি, আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল।

তারপর?

বেশিক্ষণ কথা বলা যায় নি। আমার বাস হর্ন দিয়েছিল।

বুড়ি তোমার কাছ থেকে কিছুতেই আর ভিক্ষে নেয় নি। সে তোমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল তার বাড়িতে। তার নাতি–নাতনীদের দেখাবে একজন গ্রামের মানুষ।

যাওয়ার উপায় ছিল না, একটু পরেই বাস ছেড়ে দিল।

তুমি বুড়িকে কী কথা দিয়েছিলে?

বলেছিলুম। আবার আসবো। শিগগিরই। বলেছিলুম, বোঁচার মা, তোমার কাছ থেকে সব গল্প শুনবো। কী করে তুমি ফরিদপুরের সেই গ্রাম থেকে এত দূর দন্ডকারণ্যে এসে পৌঁছলে।

তুমি সেই কথা রাখো নি।

ঐ পথ দিয়ে যে আর ফেরা হয় নি!

পরে তো আবার যেতে পারতে!

দ্যাখো, মধ্যপ্রদেশ কত দূর, বার বার কি আর যাওয়া যায়? জগদলপুরের এস পি বলেছিল আবার আমাদের নেমন্তন্ন করবে ...সে আর চিঠিপত্র কিছু লিখলো না।

সেই জন্যই তুমি ঐ বুড়ির কাছে কথা রাখলে না। সে, প্রত্যেকটি বাস এসে থেমেছে, আর তোমাকে দেখবে বলে ছুটে গেছে। সেই বুড়ি, যার কোলে শুয়ে তুমি জীবনে প্রথম কেঁদেছিলে, তার বাড়িতে তুমি যাও নি, আর এই ডিমওয়ালী বুড়ির জন্য এত টান।

দ্যাখো, একবার একজনের কাছে কথা রাখতে পারিনি বলেই তো অন্যদের কাছে কথা রাখবার বেশি করে চেষ্টা করতে হয়।

ডিমওয়ালীর কাছে তো তুমি কোনো কথা দাওনি। সে বলেছিল, বাবা, তুমি একদিন আমার বাড়িতে আসবে? তুমি কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু হেসেছিলে। তারপর রূপানারায়ণের পাড়ে শুয়ে নিছক একটা দিবাস্বপ্ন দেখে...

কারণটা যাই হোক না কেন, পাড়াগাঁর দিকে একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় দোষের তো কিছু নেই। কলকাতার এত কাছেই যখন।

আসল কারণটা তুমি স্বীকার করতে চাইছো না। আসল কারণ হচ্ছে, তুমি রোমির থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছো!

না, না, না, মোটেই তা নয়। আমি রোমির খুব কাছাকাছি যেতেই চাই না। তাজমহল দূর থেকেই ভাল দেখায়।

দূর থেকে ভাল দেখায় বলেই কেউ দূরে থেমে থাকে না। সবাই তাজমহলের কাছেই যায়। রক্তমাংসের সুন্দরকে মানুষ অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চায়।

না, না, না, তুমি কী বলছো! রোমির জন্য আমি... তা একেবারেই অসম্ভব!

অসম্ভব হতে পারে, তবু তো ইচ্ছে হয়। রোমির ঠিকানা জানবার পর তোমার দু'একবার ইচ্ছে হয়নি ওর বাড়ির রাস্তা দিয়ে একটু হাঁটতে?

মোটেই না!

নিজের কাছেও নিজেকে লুকোচ্ছো? মানুষের দুটো সত্তা থাকতে পারে। তিনটে কি হয়? ইচ্ছে তোমার হয়েছিল ঠিকই, তবু রোমির সঙ্গে তুমি যোগাযোগ করো নি ভয়ে। তোমার ভয় রফিক তোমাকে কোনো ফাঁদে ফেলতে চাইছে।

যাঃ, যত সব বাজে কথা। রফিক আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সে আমায় কোনোদিন ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে না।

ফাঁদে মানে বিপদে ফেলার কথা বলছি না! কিন্তু রফিক যে তোমাকে নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে তাও তুমি বুঝতে পারো নি? রফিক যাকে বলে, মজা?

কী এক্সপেরিমেন্ট?

রফিকের অনেক সুন্দরী সুন্দরী কাজিন আছে। তাদের অন্য কারুর সম্পর্কে কোনো কথা তুমি রফিকের মুখে কখনো শুনেছো? রোমি সম্পর্কেই রফিক বেশি উৎসাহী। রোমি প্রায়ই আসে রফিকের সঙ্গে দেখা করতে। ঈদের দিনেও রফিক যখন একা ছিল, তখন রোমি ওর ঘরে ছিল। হয়তো আগ্রহ আর উৎসাহটাই আস্তে আস্তে প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছে।

ও হ্যাঁ, এটা তুমি ঠিক বলেছো। এটা হতে পারে। রোমি সম্পর্কে কথা বলার সময় রফিকের মুখ চোখ বদলে যায়। এটা রিসেন্টলি দেখছি।

রোমি বিদ্রোহিনী টাইপের। রফিক তো এইসবই পছন্দ করে। রফিক নিজের বাড়িতে একাবর শুয়োরের সসেজ খেয়ে কী রকম হুলস্থূলু বাধিয়েছিল মনে নেই?

তাহলে.... তাহলে .... একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, রফিক কেন রোমিকে আমার সঙ্গে একা একা ছবির প্রদর্শনীতে পাটাতে চাইছিল?

তুমি একটি অতি বোকা, নীলু! একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে। এটাই তো রফিকের মজার খেলা! তুমি যেই রোমিকে দেখে মুগ্ধ হলে, খুব একটা দেবী দেবী ভাব করে রোমিকে পুজো করতে শুরু করে দিলে, তখনই শুরু হয়ে গেল ওর এক্সপেরিমেন্ট। ও দেখতে চায়, তুমি কতটা এগোও। রোমি তোমার দিকে ঝোঁকে কি না। তাহলে ও সরে দাঁড়াবে, সে ব্যাপারে রফিক উদার!

রফিকটা একটা পাগল!

যার হাতে প্রচুর সময়, টাকা-পয়সার কোনো চিন্তা নেই, তার এরকম পাগলামি বেশ মানিয়ে যায়। আমরা সবাই কিছু কিছু বে-নিয়মের কাজ করতে চাই। কিন্তু পারি না।

রফিককে তাহলে একটা চিঠি লিখতে হবে। ওকে জানিয়ে দেবো যে জীবনে আর কোনোদিন আমি রোমির সঙ্গে দেখা করবো না।

খবরদার ও কাজও করো না। ও রকম লিখলেই রফিক বুঝে নেবে যে রোমি সম্পর্কে তোমার দুর্বলতা একেবারে বদ্ধমূল! রোমির সঙ্গে রফিকের বিয়ে হলে তারপর কি তুমি রফিকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দেবে? রফিক তার বন্ধুদের ভালবাসে, তোমাকে বেশি ভালবাসে। রোমি সম্পর্কে তুমি বরং স্বাভাবিক হয়ে যাও। আর পাঁচটা মেয়ের মত। রফিকের স্ত্রী হিসেবে তার সঙ্গে তোমার প্রায়ই দেখা হবে, তখন তুমি তার সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করবে, যেমন অন্য বন্ধুপত্নীদের সঙ্গে করো।

ঠিক আছে, সেটাই চেষ্টা করা যাবে তা হলে।

কী নীললোহিত, কষ্ট হচ্ছে?

কষ্ট তো হবেই একটু একটু। কোনো একজন বিশেষ রমণীকে একেবারে সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনা কি সহজ?

আস্তে আস্তে সহ্য হয়ে যাবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না!

॥ আট ॥

নিজের সঙ্গে সংলাপে আমি এতই নিমগ্ন হয়ে পড়েছিলুম যে আর একটা ট্রেন এসে যে থেমেছে তা খেয়াল করি নি। এমনকি আওয়াজ পর্যন্ত পাই নি। সামনে দিয়ে অনেক লোকজনের যাতায়াতে ঘোর ভাঙলো। তাড়াতাড়ি একটা ডাক শুনে চমকে উঠলুম!

পান-বিড়ি! পান-বিড়ি-সিগ্রেট! চাই পান...

আমার থেকে মাত্র দু'তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে ছেলেটি। পনেরো-ষোলো বছর বয়েস হবে। পাজামা আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা। কোমরের কাছে ঝোলানো ডালাটিতে অল্প কিছু সিগারেট আর পান।

এই সেই বুড়ির নাতি?

এতক্ষণ এই পানওয়ালা কোথায় ছিল? হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো। ছেলেটির খালি পা, মাথার চুল চটলা মতন, সমস্ত চেহারাটিতেই দারিদ্র মাখানো। ব্যবসার উন্নতির জন্য ও আরও খাটে না কেন? সকাল থেকে কতগুলো ট্রেন চলে গেল।

আমি ছেলেটিকে চোখে চোখে রাখলুম। ট্রেনটা চলে যাক। যাত্রীর সংখ্যা কমুক, তারপর ওকে ধরবো।

কিন্তু একটা ব্যাপারে খটকা লাগলো। বুড়ির নাতি জেল খেটেছিল। পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে কি জেলে যায়? ছিঁচকে চুরি-টুরি কিছু করেছিল বোধহয়।

একজন মহিলা অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বসেছে আমার বেঞ্চের বাকি জায়গাটায়। একটা বাচ্চা আবার বমি করতে শুরু করেছে।

আমি উঠে পায়চারি করতে শুরু করলুম। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরমও পড়েছে খুব। পিঠের জামা ভিজে ভিজে। প্রথমে এসে এই স্টেশনে যত লোক দেখেছিলুম, সেই তুলনায় এখন লোক অনেক কম। দুপুরের দিকে ট্রেনও কম থাকবে।

প্রত্যেক রেল স্টেশনের কিছু পোষা থাকে। এক জায়গায় মাদুর পেতে কিছু লোক তাস খেলছে। জলের কলের কাছেই একটি পরিবারের পাকাপাকি আস্তানা। এক জায়গায় পড়ে আছে কয়েকটা সোডার বোতলের ক্রেট। বোতলগুলোতে কোনো লেবেল নেই। এইসব সোডা কলকাতায় চলে না। লোকাল ট্রেনে আমি অনেকবার দেখেছি, পনেরো-কুড়ি পয়সায় এক এক বোতল বিক্রি হয়। এগুলো আসলে ভুসভুসে জল। চালওয়ালী, ফড়েরা এই সোডা কেনে। একটা হাফ পাউণ্ড পাঁউরুটির মাঝখানটায় গর্ত করে একটু একটু এই সোডা ঢালে আর কামড়ে কামড়ে খায়। পাঁউরুটি আর সোডা, এই হলো তাদের খাদ্য।

পান-বিড়িওয়ালাকে একটু নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললুম, এক খিলি পান সাজ তো। আর এক প্যাকেট চার্মিনার দে!

যা পান সাজার ছিরি, এর পান বিক্রি হবে কেন? কিচ্ছু জানে না। পুরো এক প্যাকেট সিগারেটও আমাকে দিতে পারলো না, মোটে ছ'টা আছে।

আমি কস্মিনকালে পান খাই না। এই ছোঁড়ার পান খাওয়া তো আরও অসম্ভব। আমি বললুম, পানটা কাগজে মুড়ে দে। তোর বাড়ি কোথায় রে?

ছেলেটি বাঁ হাত তুলে বললো, ঐ ওদিকে।

কাদাখোলা গাঁয়ে?

অচেনা একজন লোকের মুখে নিজের গ্রামের নাম শুনে যে-কেউ একটু সচকিত হবে। এ ছেলেটার বোধহয় আশ্চর্য হবার ক্ষমতাই কম। সে শুধু মাথা নাড়লো দু'দিকে।

কাদাখোলা গ্রামটা কোথায় তুই চিনিস?

না, বাবু।

তুই সোনারপুরে থাকিস, কাদাখোলা চিনিস না?

না। দিয়াশলাই নেবেন?

আর কিছু চাই না। একটা কথা শোন। একজন বুড়িকে তুই চিনিস? বেশ বুড়ি, গাড়িয়াহাট বাজারে রোজ ডিম বিক্রি করতে যায়। এইখান থেকেই ট্রেনে চাপে।

কত বুড়ি-টুড়িই তো যায়!

তোর কোনো দিদিমা বা কেউ যায় না?

না!

আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলুম। এ ছেলেটা একেবারে অপদার্থ! ও বুড়ির নাতি না হতে পারে, একটা কিছু খবর তো অন্তত দিতে পারতো! কিছুই জানে না!

বিরক্ত মুখে আমি দূরে সরে গিয়ে রেল লাইনে ফেলে দিলুম পানের খিলিটা। আমার বেশ আশা হয়েছিল এই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি কাদাখোলায় যাবো।

আবার আর একটা ট্রেন আসছে কলকাতার দিক থেকে। আজকের মতন আমার গোয়েন্দাগিরি শেষ। এই ট্রেনটায় দি ক্যানিং-এর হয় তাহলে উঠে পড়বো।

পান-বিড়িওয়ালা ছোকরাটি ঘুরে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বললো, বুঝিচি বাবু, আপনি লোচনদাকে খুঁজছেন।

না তো। কে লাচনদা? তাকে খুঁজবো কেন?

আপনি যে লোচনদার ঠাকুমার কথা বললেন? সেই বুড়ি ডিম ব্যাচে। কলকেতায় যায়। যাবার সময় রোজ লোচনদার পিঠে হাত বুলোয়। এক একদিন ফেরত আসার সময় লোচনদাকে পয়সা দেয়।

সেই লোচনদা কোথায়?

সেও পান-সিগ্রেট ব্যাচে। তিন চারদিন আসবে না। কোথায় যেন নুকিয়ে রয়েছে।

কেন, লুকোবে কেন?

একজনের সঙ্গে মারামারি হয়েছে। এই এস্টেশনে এক শালা হারামী আচে, আমাদের ব্যবসা করতে দেবে না। আমাদের কাছ ঠেঙে পয়সা চায়। জবরদস্তি করে। আমারও মালপত্তর একদিন ছিরকুট করে দিয়েচে।

কথা বলতে বলতে ছেলেটি চায়ের দোকানের দিকে আড়চোখে তাকায় তারপর ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মে ঢুকতেই এগিয়ে যায় সেদিকে।

তাহলে বুড়ির নাতি একজন সত্যিই আছে এই সোনারপুরে। কিন্তু তার দেখা পাওয়া যাবে না। সে লুকিয়ে আছে কোথাও। সেই পুরোনো কাহিনী। একদল লোক কাজ করে, আর একদল লোক কাজ না করে অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাতে চায়। সব বড় বড় স্টেশনেই এরকম মাস্তান থাকে দু'একজন।

প্রথম এসে চা খে[illegible] খেতে যে লোকটির কথা শুনছিলাম, সেই বোধহয় ওদের মধ্যে একজন। এখন এই [illegible] নামের লোকটির বেশি খোঁজখবর নেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। অবশ্য, বারা[illegible]নার ও সি যে আমার মামা এই কথাটা আন্ডার ওয়ার্ল্ডে রটে গেছে নিশ্চয়ই। সহজে [illegible] আমার গায়ে হাত দেবে না।

কলকাতার ট্রেন থেমেছে, কাছাকাছি একটা কামরা থেকে নামলো চার পাঁচটি মেয়ে। তাদের একজনের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো।

এই সেই হিলহিলে কিশোরী ময়না, আজ সকালেই যার কাছ থেকে আমি এক কিলো ঝিঙে কিনেছি! আজ সকালেই মাত্র জেনেছি ওর নাম। তবু মনে হচ্ছে কতদিনের চেনা!

বাজার সেরে এরা এত দেরি করে ফেরে? এরপর পায়ে হেঁটে গ্রামে যাবে। এরা খায়দায় কখন?

ময়নাই প্রথম কথা বললো আমার সঙ্গে।

এক একজনের মুখে বিস্ময়বোধ চমৎকার ফোটে। ময়নার সারা মুখজোড়া বিস্ময়। ঠোঁটে পাতলা হাসি। খানিকটা খুশীও হয়েছে। হাতের খালি ঝুড়িটা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এসে বললো, ও বাবু, তুমি এতদূর এয়েচো? ও মা গো!

তারপর ময়না তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট কাপড়ের থলে বার করলো। তার থেকে আবার একটা সিকি বার করে বললো, এই নাও!

–এ কি!

–তোমার পঁচিশ পয়সা বাকি ছিল।

–তা বলে সেটা এখানে দিতে হবে? আর একদিন বাজার থেকে নিয়ে নিতে পারতুম না।

অন্য মেয়েগুলো হেসে উঠলো। একজন বললো, এই বাবুকে তো বাজারে প্রায়ই দেখি। অন্য মেয়েরা মাথা নাড়লো। তারা সবাই আমাকে চেনে, যদিও ওদের মুখ আমার কাছে অচেনা।

ময়দানে রফিকের সঙ্গে যে পাঁচটি নারীকে দেখেছিলুম, তাদের মধ্যে মিতুন নামের মেয়েটির সঙ্গে ময়নার মুখের বেশ মিল আছে। মিতুনের ভুরু প্লাক করা, মুখে প্রচুর প্রসাধন। কথা বলে আধো-আধো সুরে, সেই তুলনায় ময়নার মুখে ঘাম মেশানো ময়লা, কিন্তু ব্যবহার কত সাবলীল। একটা অদম্য প্রাণশক্তি ফুটে বেরুচ্ছে তার সারা শরীর দিয়ে। বাজারে ময়নাকে আমি শুধু বসে থাকা অবস্থাতেই দেখেছি, এখন বোঝা গেল বেশ লম্বা। তার কোমরটি অতি দর্শনীয়। এই মেয়েটিকে যত্ন করে খেলাধুলো শেখালে অলিম্পিক থেকে সোনা-রুপো কিছু নিয়ে আসতে পারতো মনে হয়।

ময়না জিজ্ঞেস করলো, তুমি কোথায় যাবে ক্যানিং?

না। কাদাখোলা।

সত্যি? হি-হি-হি-হি!

একজন দুঃখী দুঃখী চেহারার মধ্যবয়স্ক লোক কাছে এসে দাঁড়ালো। এ কিন্তু বুড়ির অন্য পাশে বসা বিক্রেতাটি নয়। তবে এর চেহারা দেখলেই বাজারের দোকানদার বলে মনে হয়।

একে দেখে আমি একটু স্বস্তি বোধ করলুম। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো আমার কর্ম নয়। ময়না বার বার হেসে আমাকে নার্ভাস করে দিচ্ছে।

লোকটির থুতনিতে ছাগল-দাড়ি, মাথার চুল পাতলা, হেঁটো ধুতির ওপর সে যে ফতুয়াটা পরে আছে সেটা এককাল নিশ্চয়ই সাদাই ছিল। তার চোখদুটি দেখলে মনে হয় কাজল টানা, তাতে গভীর দুঃখের ছাপ।

লোকটি নম্র গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাবু, কোথায় যাবেন?

–এদিকে কাদাগোলা নামে একটা গ্রাম আছে না?

–সেখেনে যাবেন? রাস্তা বেশ খারাপ, আপনারা যেতে পারবেন না।

–শোনো, আমাদের বাজারে একজন বুড়ি ডিম বিক্রি করতে আসতো, তার সঙ্গে আমি দিদিমা সম্পর্ক পাতিয়েছিলুম।

ময়না আবার হি হি করে জোরে হেসে উঠলো। তার হাসির ছোঁয়াচ লাগলো অন্য মেয়েদের মুখে। কিন্তু তাদের হাসির মধ্যে আমার কথার সম্মতি আছে।

দুঃখী লোকটি অবাক ভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে।

এদের কাছে আমি কোনো মিথ্যে কথা বলবো না ঠিক করেছিলুম, কিন্তু এরা যে সত্যি কথা নিয়েও কৌতুক করে।

সেই বুড়ি একদিন তার বাড়িতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, খুব করে যেতে বলেছিল। আজ এদিকে এসেছিলুম একটা অন্য কাজে, তাই ভাবছি একাবর ওর বাড়ি ঘুরে আসবো। তোমরা কেউ তার বাড়ি চেনো?

লোকটি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে রে?

ময়না ও আরও একটি মেয়ে একসঙ্গে বললো, ঐ যে কাদাখোলা থেকে আসে, আক্কাসের নানী।

আর একটি মেয়ে বললো, এই টেরেনেই তো রোজ ফেরে। দু' চারদিন দেখছি না। একদিন আমাদেরকে পান খাওয়ালে!

লোকটি চিনেছে, মাথা নাড়লো দু'বার।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, আপনি কাদাখোলায় যাবেন?

এটা নিছক প্রশ্ন নয়, এই সরল বাক্যটির মধ্যে যেন অনেক কিছু আছে। সে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।

–তোমরা একটু রাস্তাটা যদি দেখিয়ে দাও!

–চলেন!

টিকিট চেকিং–এর কোনো ব্যাপার নেই, আমরা রেল লাইন ধরেই হাঁটতে লা–গলুম। ট্রেনে আমিও কয়েকবার টিকিট ফাঁকি দিয়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কত উত্তেজনা, রোমাঞ্চ, শিহরন ছিল। এদের ব্যাপারটা একেবারেই নিরামিষ।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম, তোমরা যে রোজ ট্রেনে যাতায়াত করো, তোমাদের পয়সা লাগে না বুঝি!

লোকটি অভিযোগের সুরে বললো, মাঝে মাঝে লাগে।

ময়না বললো, একটা কালো কোট আছে, মহা টেটিয়া।

আর একটি মেয়ে বললো, ওটা একটা পাজির পা–ঝাড়া!

আর একটি মেয়ে বললো, আজ লোকটাকে দেখলুম, ঢাকুরিয়া এস্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ডাঁড়কাকের মতন এদিক উদিক চাইছে।

ময়না বললো, ডাঁড়কাক না শকুনি!

তারপর শুরু হলো টুকিটাকি ট্রেনের গল্প। মেয়েরা ঐ লোকটাকে দিন্দা বলে ডাকছে। বোধহয় ওর নাম দিনু। কিংবা দিন্দা–ও কারুর নাম হতে পারে। কথা শুনে বোঝা গেল এই দিন্দা বেশ নিরাক্ত ধরনের মানুষ। মাস খানেক আগে ট্রেনে ফেরার সময় তার টাকার গেঁজে চুরি গেছে। সে জন্য তার খুব হা–হুতাশ নেই। সে বললো, যে নিয়েছে সে কি বড়লোক হবে? দু' দিন বাদে আবার যে–কে সেই। আমায় সুদুমুদু সুদ গুণতে হলো!

দিন্দার সঙ্গে কথা বলে আর একটা নতুন তথ্য জানতে পারলুম। এই যে সব ছোট ছোট দোকানদাররা গ্রাম থেকে জিনিসপত্তর কিনে শহরের বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি

করে, এই সামান্য ব্যবসার মূলধনের টাকাটাও মহাজনের কাছ থেকে ধার করতে হয়। তার সুদ টাকায় দশ পয়সা, প্রতিদিন!

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করলে বোধহয় আঠেরো পার্সেন্ট সুদ দিতে হয়, বছরে। আর এই যে মহাজনেরা প্রতিদিন দশ পার্সেন্ট সুদ নেয়, সেটা বছরের হিসেবে কত পার্সেন্ট হয় সে অঙ্ক কষার সাধ্য আমার নেই। চাষীর উৎপাদন আর শহরের ক্রেতা, এর মাঝখানে যে কতগুলি মিডলম্যান থাকে, তার সঠিক হিসেব কি কেউ রাখে?

একবার বন্ধুবান্ধবরা মিলে বেড়াতে গিয়েছিলাম কাকদ্বীপে। গঙ্গায় এক মাছ-ধরা নৌকো থামিয়ে ইলিশ কিনতে চেয়েছিলুম, চকচকে ঝকঝকে গোটা দশেক ইলিশ দেখেছিলুম সেই নৌকোয়, কিন্তু জেলেরা বলেছিল, ও ইলিশ বিক্রির নয়। মহাজনের কাছ থেকে দাদন নেওয়া আছে, সব মাছ আগে তাকে দিতে হবে।

এই মহাজনদের কী রকম দেখতে হয়? যারা সুদে টাকা খাটায়, তাদের মহাজন নাম রেখেছে কে?

রোদের ঝাঁঝ এমন যে সারা গায়ে যেন বিছুটি লেগেছে। ময়নাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, ওরা এই পথে নিত্য তিরিশ দিন যাতায়াত করে। আমারও হাঁটতে খারাপ লাগে না, তবে এই অ্যাডভেঞ্চারটি শীতকালে হলে আরও মনোরম লাগতো।

রেললাইন ছেড়ে আমরা চলেছি মাঠের রাস্তা দিয়ে। দুটি মেয়ে একটু আগে বিদায় নিয়েছে। আরও দু'জন এখন চলে গেল। ময়না আর দিপা থাকে একই গ্রামে।

ময়না আগে চাল চোরা-চালানের কাজ করতো, তখন সে বেশ ছোট ছিল, তবে সেই কারবারে লাভ ছিল বেশি, ঝুঁকিও ছিল অবশ্য। এখন চালের কারবারে ভাটা পড়ে গেছে।

সেই একটা সময় গেছে বটে। জেলায় জেলায় কর্ডন, এ জেলার চাল অন্য জেলায় নেওয়া যাবে না। র‍্যাশনিং ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেককে কম চাল খেতে হবে। কিন্তু শহরে যাদের ক্রয়ক্ষমতা আছে, তারা চাল কিনবেই, বেশি দাম দিয়ে কিনবে, তারা র‍্যাশনিং ব্যবস্থা মানে না। ডিমাণ্ড থাকলে সাপ্লাই লাইনও যে-রকম ভাবেই হোক চালু থেকে যায়। সরকারের অদ্ভুত নীতির ফলে বাংলার গ্রামের হাজার হাজার ছেলে- মেয়ে বেআইনী চালের কারবারে নেমে পড়ে। লোক্যাল ট্রেনে এক সময় যাত্রীর বদলে চোরা-চালানীরা বেশি থাকতো। স্টেশান আসবার আগেই রেল লাইনে ধপাধপ করে পড়তো চালের বস্তা।

সেই সময় চালের চোরা-চালানীদের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাতুম। মনে হতো, গ্রামের বউ ছেলে- মেয়েরাও ক্রিমিনাল হয়ে গেল? তাদের কারুর সঙ্গে কথা বলিনি। ময়নাও ওদেরই একজন। কিন্তু ময়নার মুখ দেখলে মনে হয় না যে ওর জীবনে কোনো পাপের দাগ আছে।

এই রকম প্রাণচঞ্চল মেয়ে, অথচ স্কুলে যাবার সুযোগ পায়নি, খেলাধুলোও করে না। ওর এখন যা বয়েস, এই বয়েসের মেয়েরা গল্প-উপন্যাসে গ্রাম্য প্রেমের নায়িকা হয়, কিন্তু ওর কি প্রেম করারও সময় আছে? রাত থাকতে থাকতেই উঠে, এতটা পথ হেঁটে, ট্রেন ধরে গড়িয়াহাট বাজারে পৌঁছোতে হয় সাতসকালে। ফেরে এই রকম ম্যাধ দুপুরে, তারপর বাড়িতে গিয়ে খাবে, কে জানে রান্না করা আছে কি না। বিকেলে আবারহাটে যাবে সওদা করতে, মহাজনের টাকা শোধ করবে..সন্ধের পর

গ্রামের জীবনে আর কিছু ক্রিয়াকলাপ নেই। সারাদিন যে মেয়েটিকে এত খাটতে হয়, তা তো খেলাচ্ছলে নয়। সুতরাং যে-কাজে সামান্য বেশি রোজগার, সেই কাজেই ও ঝুঁকবে।

সেই বাহাত্তর বছরের ডিমওয়ালি বুড়িও এতখানি পথ হেঁটে যেত? এ যে কল্পনা করাই শক্ত। তার একটা নাতি আছে, সে ঐ বুড়িকে খাওয়াতে পারে না?

ওরা বললো, বুড়ির নাতির নাম আক্কাস। স্টেশনের পান-বিড়িওয়ালা যে বললো, বুড়ির নাতির নাম লোচন? দু'জন তা হলে আলাদা নয় তো? আমি কি ভুল বুড়ির কাছে যাচ্ছি?

ময়নাকে জিজ্ঞেস করলুম সে কথা।

ময়না বললো, ঐ আক্কাস আর লোচন একই মানুষ গো! এস্টেশানে ওকে লোচন লোচন বলে, একটা চোখ কানা কিনা!

দিন্দা বললো, ছোঁড়াটা বড় চুলবুলে। কাজকর্মে মন নেই, উটকু ঝোন্‌ঝাটে বেশি মন।

ময়না প্রতিবাদ করে বললো, আহা, ওর কি দোষ? গায়ে খেটে রোজগার করলেও দুটো গুণ্ডো জোর করে পয়সা আদায় করে ওর কাছে ঠেঙে। ও তাই জেদাজেদি করে।

দিন্দা বললো, ঐ করেই তো একটা চোখ খোয়ালে। তারপর আবার গারদে গেল। আমাদের কি বাবু ওসব পোষায়? ঐ গুণ্ডোদের সঙ্গে পারবে কেন? আমাদের সঙ্গে বাজারে বসলেই পারতো। তা নয়, ও এস্টেশানেই থাকবে!

আমি বললুম, আবার তো শুনলুম মারামারি করেছে।

দিন্দা উদাসীনভাবে বললো, ও লেগেই থাকবে। বুড়িটারই যত কষ্ট। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঐ বুড়ির ব্যবহার, হাসির ভঙ্গি, চেহারার মধ্যে আমি আমার দিদিমার অনেকটা আদল খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু বুড়ি আমার মধ্যে কী পেয়েছে? আমার প্রতি তার এত স্নেহ কেন?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁ গো, ঐ বুড়ির নাতি যে আক্কাস বা লোচন, তার চেহারার সঙ্গে কি আমার মিল আছে?

ময়না কাঠ-ঠোকরা পাখির মতন হি হি হি হি করে তীব্র গলায় হেসে উঠলো।

দিন্দা দু' দিকে ঘাড় নেড়ে বললো, না গো বাবু, সে কোনো মিল নেই। আপনি হলেন গে ভদ্দরলোক।

আমি বললুম, আহা, ভদ্দরলোক আর অন্য লোকে কী আছে। চেহারার মিল থাকতে পারে না! এই যে ময়না, ওর সঙ্গে তো এক মেম সাহেবের চেহারার মিল আছে, তার নাম নাদিয়া কোমানচিয়া।

ময়না আবার হাসিতে শরীর দুলিয়ে দেয়।

দিন্দাকে বললুম, তোমাকেও ধুতি আর পাঞ্জাবি পরিয়ে দিলে আমাদের পাড়ার একজন ইস্কুল মাস্টারমশাইয়ের মতন দেখাবে!

দিন্দা সহজে হাসে না। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, আমার বাপ-চোদ্দপুরুষে কেউ ইস্কুলে যায় নে।

তারপর সে থমকে দাঁড়িয়ে খানিক দূরের এক জোড়া তালগাছ দেখিয়ে বললো, ঐ উদিকে আপনার হলো গে কাদাখোলা। আর আধ ক্রোস টাক।

আমি বললুম, এতখানি রাস্তা এলুম, কই কাদা পাইনি তো। সবাই কাদার ভয় দেখাচ্ছিল?

ময়না বললো, এবার যান না উদিকে!

দিন্দা বললো, ওদিকটেয় নাবাল জমি তো, আগে নদীর গবভো ছিল, তাই ওদিকে পাঁক হয়। হ্যাঁ, একটু বেশিই হয়। যেতে আপনার কষ্ট হবে।

–কতখানি কাদা, হাঁটু ডুবে যাবে?

দিন্দা খানিকটা সান্ত্বনার সুরে বললো, না, তা নয়। হাঁটুর কমই হবে! এই ধরুন গে, এতকখানিক।

ময়না আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আপন মনে বলে উঠলো, আ মরণ, আজ এত শকুন কেন? আবার কার বাড়ির গোরু ম'লো?

আমিও ওপরে তাকিয়ে দেখলুম, আকাশ একেবারে শকুনে শকুনে ছয়লাপ। যতক্ষণ আকাশে থাকে ততক্ষণ পাখি হিসেবে শকুনগুলোকে দেখতে খারাপ লাগে না।

দিন্দা ওপরে তাকিয়ে কী যেন বিড় বিড় করে বকছে। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়ায় সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে।

ময়না ডান দিকের একটা সরু রাস্তা দেখিয়ে বললো, এইটে আমাদের গাঁ।

দিন্দা বললো, বাবু, আপনি এখন যাবেন? আমাদের গাঁয়ে গিয়ে একটু জিরিয়ে, জলটল খেয়ে নিলে হতো না!

–না, না, তার দরকার নেই। দেরি হয়ে যাবে। আমায় আবার ফিরতে হবে তো?

–বেশি ধুর নয়, আমাদের গাঁ ঐ তো হোথায়। গরিবের বাড়িতে একটু বসবেন। আমরাও মুখে কিছু দিয়ে নিতুম। তারপর একজন কেউ যেতুম আপনার সঙ্গে।

–কেন, আমি একলা যেতে পারবো না?

–তা পারবেন। তবে কী দেখতে গিয়ে কী দেখবেন, সেই হলো কথা। তুই কী বলিস রে, ময়না? কাদাখোলায় পরশুদিন কে যেন মারা গ্যাছে শুনছিলুম যেন। যদি সেই বুড়িটাই হয়।

আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। আমি দেরি করে ফেলেছি।

।। নয় ।।

দিন্দার বাড়ি দেখে আমি বেশ অবাকই হয়েছি। যত দরিদ্র তাকে মনে করেছিল–ম, ততটা সে নয় মোটেই। বেশ গোছানো ব্যবস্থা একটা চৌকো উঠোনের একপাশ জুড়ে তার বসতবাড়ি। মাটির হলেও গোবর দিয়ে নিকোনো দেয়াল, সামনে চওড়া দাওয়া। উঠোনের আর এক পাশে রান্নাঘর, তার উল্টো দিকে একটি গোয়াল ঘর, সেটি যদিও আপাতত শূন্য। উঠোনের আর এক পাশে একটি ডোবা, আর জলের রং কালচে, এক পাড়ের বাঁশঝাড় থেকে পাতা ঝরে ঝরে পড়ে সেই ডোবার মধ্যে। এই রকম জলে কইমাছ, শিঙ্গি–মাগুর ভালো হয়।

দুটি বেশ তেজালো চেহারার হাঁসা-হাঁসীও প্যাক প্যাক করছে উঠোনে। রান্না ঘরের পাশটিতে একটি নধর ছাগল বাঁধা, সে কালো রঙের বোঁদের মতন এক রাশ নাদি ছড়িয়েছে।

রান্নাঘরের উনুনে নতুন চালের ভাত ফুটছে, গন্ধতেই বুঝতে পারা যায়। হিন্দু-মুসলমান আদিবাসী নির্বিশেষে এদেশের গ্রামের মানুষ অধিকাংশই খুব অতিথি-পরায়ণ। ঐ জিনিসটা এখনো লোপ পেয়ে যায়নি। দুম্‌কার কাছে এক পৌঢ়া সাঁওতাল রমণী তার বাড়িতে আমাকে দুপুরে ভাত খেয়ে যাওয়ার জন্য কী ঝুলোঝুলিই করেছিল। অথচ তার বাড়ির চেহারা দেখে মনে হয়েছিল তারা নিজেরাই দু' বেলা খেতে পায় না।

সেই তুলনায় দিন্দা তো বেশ স্বচ্ছলই বলতে হবে।

দিন্দার নাম দীননাথ পাড়ুই, তার সাতটি ছেলেমেয়ে এবং বউটি দ্বিতীয় পক্ষের। অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের বলতেও অনেক দিনের পুরোনো, তার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়েছে সতেরো বছর আগে। এ পক্ষের ছেলেমেয়ের সংখ্যা পাঁচ। তার প্রথম পক্ষের দুটি ছেলেই ক্যানিং-এর দিকে চলে গেছে, সেখানে কাজ কারবার করে, ভালোই আছে। বাপের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়নি। পালা-পার্বণে বাড়ি আসে। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে বারুইপুরে, জামাই সাইকেল রিক্সা চালায়। বাকি ছেলেমেয়েরা এখনো যুগ্যি হয়নি।

উঠোনে এসে নিমগাছের ছায়ায় খাটিয়ায় বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই দিন্দা তার পুরো পারিবারিক ইতিহাস আমাকে শুনিয়ে দেয়।

আমি কিন্তু প্রথমে অন্য কথা ভাবছিলুম। বাজারে চালকুমড়ো-বেগুন-বরবটি-টম্যাটো বেচেও কারুর সাতটি ছেলেমেয় সমেত সংসার মোটামুটি ভালোভাবে চলে যেতে পারে! কতই বা লাভ হয় ওতে? এর মাঝখানে আবার পাইকার, মহাজন, রেলের টিকিট চেকার ইত্যাদি ডাঙার কুমীরদের উৎপাত আছে!

পরে শুনলুম, কাকাদের সঙ্গে দিন্দার কিছু ভাগচাষের জমিও আছে, সেখান থেকে সম্বৎসরের খোরাকির ধান অনেকটাই এসে যায়। অবশ্য তার কাকারা নাকি তাকে কিছুটা ঠকায়।

ময়না আগেই বিদায় নিয়েছে, নিজের বাড়ির উঠোনে পা দেওয়া মাত্রই দিন্দার অদ্ভুত এক পরিবর্তন আমি লক্ষ করেছিলুম। এখন সে আর একজন সামান্য দোকানদার নয়, সে এখানে হেড অফ দা ফ্যামিলি। সে বাড়ি-জমির মালিক। এসেই সে তার ছেলেমেয়েদের হুকুম করতে লাগলো।

আমি যে বাজারে যাই, দিন্দা সে বাজারে বসে না, সে বসে অন্য বাজারে। ময়নার সঙ্গে সে এক ট্রেনে যায়, আসে। আমি তার খদ্দের নই, তবু আমাকে সে খাতির করতে লাগলো তাতে আমি অপ্রস্তুতের এক শেষ। আমাকে কি সে বাবু সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য করছে? কিন্তু আমি তো সেই সমাজের কেউ না! সেই সমাজ তো আমাকে হেলা-তুচ্ছ করে।

একটু পরে বুঝতে পারলুম, ভালো মানুষীতেই তার আনন্দ। এরকম মানুষ আছে, যারা প্রতিদানে কিছুই চায় না, শুধু নিজেদের ভালোত্ব নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে।

দিন্দার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করছিলুম ঠিকই, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনের একটা অংশ কাদাখোলা গ্রামের সেই বুড়ির কথাই চিন্তা করছিল। সত্তরের বেশ ওপরে বয়েস, দীর্ঘ এক মাস রোজার উপোষ, বেশ কিছুদিন বাজারে যেতে পারেনি... তার মৃত্যু কিছুই আশ্চর্যের নয়। এরকম একজনের মৃত্যু নিয়ে পাশের গ্রাম কেন, তার নিজের গ্রামের কেউও বোধহয় মাথা ঘামায়নি। প্রতিবেশীরা কবরে মাটি দিয়েছে। জানাজা হবে কি তার? নাতিটা কোথায় লুকিয়ে আছে...

এরকম একটা অবস্থায় আমি ওখানে গিয়ে হাজির হলে খুবই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়তুম।

বুড়ির মৃত্যুর কথা ভেবে যে সে রকম একটা কিছু কষ্ট হচ্ছে তা নয়। আমি যে এতটা উদ্যম নিয়ে এই পর্যন্ত এলুম তবু দেখা হলো না, সেটার জন্যই খারাপ লাগছে। নিজের কাছেও নিজের বাহবা নেবার একটা ব্যাপার থাকে। আবার মনের মধ্যে কেউ এই নিয়ে বিদ্রূপ করতেও ছাড়ে না।

আমাকে বসিয়ে রেখে দিন্দা এক ফাঁকে ডোবাতে স্নান সেরে এলো। তারপর লুঙ্গি পরে, পরিপাটি চুল আঁচড়ে আমার কাছে এসে বললো, বাবু চারডি মুড়ি খাবেন তো। বাতাসা আর কলা আছে। কিন্তু ঘরে তো দুধ নেই। আপনার কষ্ট হবে। আমাদের বাড়িতে ভাত তো খাওয়া চলবে না। আপনার–

আমার খুব একটা খিদে পায়নি। তবে নতুন চালের ভাত রাঁধবার গন্ধে মনটা একটু আনচান করে উঠেছিল। ভাত সম্পর্কে একটা জন্মসংস্কার আছে। গরম ভাতের চেয়ে উপাদেয় পৃথিবীতে আর কিছুই লাগে না।

–কেন, ভাত খেতে পারবো না কেন? ভাত কম পড়বে?

–আরে, কী যে বলেন, দুটি চাল ফুটিয়ে নিতে আর কতক্ষণ লাগে? তবে সকলে তো আর সব বাড়িতে খায় না। ভোটের সময় বাবুরা আমাদের বাড়ি থেকে রুটি চেয়েছেলেন, তা রুটির তো পাট নেই।

–আমি মুড়ি বা রুটির চেয়ে দু' গাল ভাতই পছন্দ করি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় আমার জন্য কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ির পেতে দেওয়া হলো। পিঁড়ি মাত্র একখানিই আছে। দিন্দা জানালো সেটা তার প্রথম বিয়ের পিঁড়ে।

গরম ভাত, অড়হর ডাল, আর ঝিঙেভাজা। এই ঝিঙে ভাজা আমি প্রথম খেলাম, অল্প ব্যসনে ডুবিয়ে বেশ মুচমুচে, যদিও ঝিঙেটা একটু জালি এই যা। এর সঙ্গে খানিকটা পোস্তবাটা। সব মিলিয়ে খুব একটা আহামরি কিছু বলা যায় না, তবে বেশ তৃপ্তি হলো।

আমরা আমিষ–ভুক বলে ভাত কম খাই। গ্রামের লোকেরা মাছ–মাংস কম পায়। তাই বেশি ভাতে সেটা পুষিয়ে নেয়। আমার ভাত নেওয়া দেখে দিন্দা বেশ ব্যথিত সুরে বলতে লাগলো, আপনি কিছুই খেলেন না, আপনার রান্না পছন্দ হয়নি। ও ঝেবনের মা, বাবুর জন্য এট্টু বেগুণ পোড়া দিলে তো পারতি, ঘরে কি একটাও ডিম ছিল না? হায় আমার পোড়া কপাল।

ঝেবনের মায়ের স্বভাবটা বেশ কাঠ কাঠ। শব্দ করে হাঁড়ি নামায়, ঠকাস করে গেলাস রাখে। কে জানে, বাড়িতে অতিথি আসায় সে বিরক্ত হয়েছে কি না, দিন্দা

নরম প্রকৃতির লোক, দ্বিতীয় পক্ষের বউ তাকে যথেষ্ট শাসনে রাখে বোঝা গেল। সেইজন্যই কি তার মুখে একটা দুঃখী দুঃখী ভাব, নইলে অন্য কোনো অভাব তো তার তেমন একটা নেই।

খাওয়ার পর আবার আমরা উঠোনের খাটিয়ায় এসে বসলুম। দিন্দা এখনো আমাকে ছাড়বে না, সে আমাকে কাদাখোলায় পৌঁছে দেবে বলেছে। আমি তাতে আপত্তি করিনি। কাদাখোলায় শেষ পর্যন্ত একবার যাওয়া দরকার ঠিকই, কিন্তু একা যেতে আমার মন সরছে না।

এবারে আমার সঙ্গে দু'-তিনটে কথা বলতে না বলতেই দিন্দা ঘুমে ঢলে পড়লো। এ জন্য তাকে একটুও দোষ দেওয়া যায় না। সেই সাত-সকালে ওঠে। সারাদিন কত পরিশ্রম। খাওয়ার পর একটু ঘুম নিশ্চয়ই তার অভ্যেস হয়ে গেছে।

আমি চুপ করে বসে রইলুম। আকাশে এখনো শকুন উড়ছে অনেক। খুব কাছেই কোনো গাছে ঘুঘুর ডাক শুনতে পাচ্ছি। প্রথমবারের ডাকটা শুনে গা ছমছম করে উঠলো। ঘুঘু নির্জনতা-প্রিয় পাখি। যে বাড়িতে লোকজন থাকে সে বাড়ির কাছাকাছি নাকি ঘুঘু আসে না। গেরস্থের বাড়িতে ঘুঘুর ডাক অমঙ্গলজনক, সেই জন্যই বলে।

হাঁস দুটো নেমে গেছে ডোবায়। পাঁঠাটা রাগত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। ও কি আমাকে ওর কোনো প্রতিযোগী ভাবছে নাকি?

দিন্দার দ্বিতীয় পক্ষের পাঁচটি সন্তানের মধ্যে জনা দু'এককে এ পর্যন্ত দেখেছি। এখন আর কারুকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়িটি বেশ নিস্তব্ধ।

আমার বন্ধুবান্ধব, পরিচিতি মানুষরা কেউ জানে না আমি এখন কোথায় বসে আছি। মা-কে বলে এসেছি, দক্ষিণেশ্বরে এক বন্ধুর বাড়িতে আমার নেমন্তন্ন। ফিরতে রাত হবে। চম্পক যদি বাড়িতে আমার খোঁজ নিতে আসে, তা হলে হকচকিয়ে যাবে একেবারে। আমার মায়ের স্বভাব আমার চেয়ে তো ভালো কেউ জানে না! মা চম্পকের সঙ্গে তর্ক করবে না, পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইবে না, কোনো কথাই বলতে চাইবে না চম্পকের সঙ্গে। চম্পক আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চেয়েছিল, সুতরাং চম্পকের আর স্নেহ পাবার অধিকার নেই। চম্পক যদি এরকম ঠান্ডা ব্যবহারের পরেও আমার চাকরির প্রসঙ্গ তুলতে চায়, তা হলে মা বলবে, না, নীলুর হলদিয়ায় যাওয়া আমার মত নেই। আমিই ওকে বারণ করে দিয়েছি। ও যদি কলকাতায় কিছু পায় তো ভালোই...পাবে তো নিশ্চয়ই, আজ না হয় কাল...

চকিতে একবার রোমির মুখখানা মনে পড়লো। তারপর যেন জলের ঢেউতে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই মুখ, ভেসে ভেসে দূরে সরে যাচ্ছে, শুধু জল আর জল, যেন অন্য কোনো দেশ। সেই দেশে আমার কোনোদিন যাওয়া হবে না।

পান চিবোতে চিবোতে ময়না এসে ঢুকলো উঠোনে। সকৌতুকে ভুরু তুলে বললো, ও বাবু, তোমরা এখুনো যাউনি?

ময়নার পিঠের ওপর এক রাশ ভিজে চুল খোলা। একটা বেগুনি ছাপ ছাপ শাড়ি পরে এসেছে। হাতে একটা তালপাতার পাখা, গোল করে পাড় বসানো। তাকেও এখন আর বাজারের সবজিওয়ালী বলে একদম চেনা যায় না। মুখে সামান্যতম হীনমন্যতার ছাপ নেই।

অ বৌদি, তোমাদের পাখা এনিছি, বলে ময়না এগিয়ে গেল ঘরের দিকে।

ঝেবনের মা বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। দিন্দা জেগে উঠে চোখ রগড়ে বললো, বেলা পড়েনি, চলেন এবার যাই।

ময়না মুখ ঘুরিয়ে বললো, হ্যাঁ খবর পেলুম, কাদাখোলায় পরশুদিনকে এক বুড়ির ইন্তেকাল হয়েছে। আক্কাসের দাদীই হবে!

দিন্দা বললো, চলেন, তবু একবার দেখে আসি, নাকি বলেন? এত দূর এলেন!

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম হ্যাঁ, আমি একবার যাবো তবু।

ময়না বললো, কাদাখোলা থেকে বদরুশেখ তো রোজই এস্টেশনে যায় ডাব বেচতে। আজও ছিল, দ্যাখোনি? তার ঠেঙে পাকা কথা জানা যেত, তখুন মনে পড়েনি!

দিন্দা বললো, একবার ঘুরে দেখে এলেই তো হয়। চল ময়না, যাবি নাকি? আমি বললুম, তোমাদের তো বিকেলে আবার কাজকর্ম থাকে। তোমরা শুধু শুধু যাবে কেন? একটা কোনো বাচ্চা ছেলে দাও না, আমায় পথ দেখিয়ে দেবে?

দিন্দা উদারভাবে বললো, চলেন, কতক্ষণই বা লাগবে। কাজ তো আছে, কাজ তো পালিয়ে যাচ্ছে নে।

এই গ্রাম ছাড়বার পর মাঝখানে গোটা কয়েক ধান জমি, তার পরেই কাদাখোলা। সেই জোড়া তালগাছের সীমানার পর থেকেই শুরু হলো কাদা।

চটি খুলে প্যান্ট গুটিয়ে নিলুম হাঁটু পর্যন্ত। তবু এ কাদার মধ্যে হাঁটা খুব শক্ত। একেবারে হড়হড়ে, প্রতি পদক্ষেপে পা পিছলে যেতে চায়। দু'তিনবার আমাকে দিন্দার কাঁধ ধরে সামলাতে হলো।

ময়না বললো, এমনিভাবে বুড়ো আঙুল টিপে টিপে হাঁটুন।

দিন্দা বললো, বাবুর জন্য একটা লাঠি নিয়ে এলে হতো রে! বাবুর অভ্যেস নেই। আমাদেরই পা হড়কে যায়। বুঝলেন বাবু, এই কাদাখোলা গাঁয়ের পেছন দিকটায় একটা বেশ বড় ঝিল রয়েছে। বর্ষাকালে সেখানে অনেক শালুক ফোটে। শাপলা তো বিক্‌কিরি হয় বাজারে, তাই অনেকে তুলতে যায়।

ময়না বললো, এতটা কাদা ভেঙে যাওয়া... পরতা পোষায় না।

ময়না ঘন ঘন তাকাচ্ছে আমার দিকে। যেন একজন শহুরে বাবু এই কাদার মধ্যে কতখানি দুর্দশায় পড়বে সেটা দেখার জন্যই তার সঙ্গে আসা।

অবিলম্বেই ময়নার প্রত্যাশা পূর্ণ করবার জন্য আমি একটা আছাড় খেলুম।

ভাগ্যিস আছাড় খেয়ে কেউ সামনে পড়ে না, মাধ্যাকর্ষণ সবাইকে পেছনে টানে। সেইজন্যই মুখ-চোখ বেঁচে গেল এবং পশ্চাৎদেশের যে কী অবস্থা হলো তা আমি নিজে দেখতে পেলুম না।

হেসে কুটি-কুটি হয়ে যাওয়া ময়নাকে একটা ধমক লাগালো দিন্দা। তার মুখে একটা কুণ্ঠিত ভাব, যেন রাস্তার এত কাদার জন্য সে-ই দায়ী। আমাকে টেনে তুলতে তুলতে সে বললো, কোমরে চোট লাগিনি তো? দেখুন দিকিনি তো কী গেরো! কোথাকার এক বুড়ি, কোনো সম্পর্ক নেই যার সঙ্গে...কী জানি কার কোথায় নিয়তি বাঁধা থাকে।

লুঙ্গি পরা, খালি, গায়ে তিনজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক একটু দূর থেকে আমাদের লক্ষ করছিল। তাদের চোখের চাহনি ঠিক সুবিধের নয়।

ময়না একটা বাঁখারি জুটিয়ে আমার পিঠ থেকে কাদা চেঁছে তুলে দিল। একেবারে আঠার মতন কাদা।

নিন্দা বললো, আর ধুর নেই। ঐ লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।

লোক তিনটি একটি শিরীষগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে এগিয়ে আসেনি। আমরা ওদের কাছাকাছি পৌঁছোবার পর ওরা রাস্তার মাঝখানে চলে এলা। আমাদের আর এগোতে দেবে না।

দিন্দা ভালো মানুষের মতন জিজ্ঞেস করলো, হ্যাঁ গো, তোমাদের গাঁয়ে এক বুড়ি মারা গ্যাছে দু'দিন আগে?

একজন বললো, গ্যাছে তো কী হয়েছে?

–এই বাবু আক্কাসের দাদীর খোঁজ নিতে এয়েচেন।

–আক্কাস এখেনে থাকে না!

–আক্কাস নয়, আক্কাসের দাদী।

–বলছি তো, আক্কাস এখেনে থাকে না।

–আহা, চটছো কেন? বাবু ভালো মানুষের মতন বুড়ির খোঁজ নিতে এয়েচেন।

একজন অমনি কড়া গলায় বলে উঠলো, বলি, তুমি ফোঁপর দালালি করে পুলিশের লোক নিয়ে এ গাঁয়ে এয়েছো কেন?

দিন্দা চোখ বিস্ফোরিত করে বললো, পুলিশের লোক? না, না, পুলিশের লোক হয় কেন?

– আলবাৎ পুলিশের লোক! আক্কাস সোনারপুরে কী করেছে না করেছে আমরা জানি না। তা বলে এ গাঁয়ের ওপর হামলা হবে কেন? দু'দিন ধরে একানে বাইরের লোক ঘোরাঘুরি করছে।

ময়না বললো, এ বাবু পুলিশের লোক নয় । আমার সঙ্গে রোজ বাজারে দেখা হয়।

একজন চিবিয়ে চিবিয়ে বললো, চুপ র তুই! পুলিশের লোক বুঝি বাজার করে না! তোর অত রস কিসের রে?

সরলবিশ্বাসী দিন্দা নতুন চোখে তাকালো আমার দিকে। পুলিশের লোক ছাড়া এতটা রাস্তা ভেঙে একটা বুড়ির খোঁজে কেউ আসে? আসলে পুলিশ থেকে আক্কাসকে খুঁজছে। .. একজন পুলিশের লোককে সে বাড়িতে ডেকে নিয়ে খাইয়েছে..গ্রামের মানুষের কাছে তার মুখ ছোট হয়ে গেল!

আমাকে পুলিশের লোক মনে করায় আমি রীতিমতন অপমানিত বোধ করলুম। এরকম কথা শুনলে পুলিশ বাহিনীরও অপমানিত বোধ করা উচিত। আমার মতন চেহারার লোক কি পুলিশ হিসেবে মানায়?

আক্কাসের মতন একজন খুদে অপরাধীকে ধরবার জন্য, যদি সে অপরাধী হয়, সেটাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, তা হলেও তার জন্য এতটা কাদা ভেঙে পুলিশের লোক আসবে, এরকম কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ এখনো আছে এদেশে?

সোনারপুর স্টেশানে বসে আমি এক জমির দালালের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলুম দারোগার ভাগ্নে হিসেবে। সেই লোকটির কাছে আমি কাদাখোলা গ্রাম সম্পর্কেও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলুম। সেই কথা কি এর মধ্যে পৌঁছে গেছে এখানে? অসম্ভব কিছু নয়।

আমি বললুম, ভাই রাগারাগি করছেন কেন? আক্কাস কে তা আমি চিনি না। তার খোঁজে আমি আসিওনি। আক্কাসের দিদিমার সঙ্গে আমার একবার দেখা করার দরকার ছিল। তা সে যদি মরে গিয়ে থাকে, তবে তো আর এ-গাঁয়ে ঢোকার কোনো দরকার নেই। চলো দিন্দা, ফিরে যাই।

দিন্দা অস্ফুটভাবে বললেন, বাবু, আপনি পুলিশের লোক?

-পুলিশ হলে কি ভয় পায়? গ্রামের লোকের কথা শুনে ফিরে যায়? আমি তো বলছিই, বুড়ি যখন বেঁচে নেই, তখন এ গ্রামে আর ঢোকার কোনো প্রয়োজন নেই আমার।

এবারে কাদাখোলা গ্রামের এক রক্ষক আমার কাছে এসে বললো, আপনি ভয় পাওয়ার কথা বলছেন কেন? আপনাকে কি আমরা সেরকম কিছু বলিছি? আক্কাসের দাদীর সঙ্গে আপনার কী দরকার?

একে আমি কী করে বোঝাবো? আমার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো। সব তো চুকেবুকেই গেছে।

তবু এদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য কিছু একটা বলা দরকার।

লোকটির চোখে চোখ রেখে বললুম, ঐ বুড়ি গড়িয়াহাট বাজারে ডিম বেচতে যেত তো? আমার সঙ্গে খুব চেনা হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই ধারে ডিম দিত আমায়? দশ-বারো টাকা পাবে বোধহয়। ময়না জানে, ও তো পাশেই বসতো। সোনারপুরের দিকে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম, বুড়ির টাকাটা শোধ করে দিয়ে যাই। ঠিক কিনা ময়না?

ময়না দু'দিকে মাথা নেড়ে বললো, মিছে কথা। বাবুর এক পয়সা ধার ছিল না। ঐ বুড়ি বাবুকে নাতি মেনেছিল। তাই বাবুটা শেষ দেখা দেখতে এসেছিল বুড়িকে, তা বুড়ির ভাগ্যে নেই তো কী হবে!

ওদের তিনজনের মধ্যে যার বয়স সে একটু বেশি সে বললো, আসেন আমার সাথে।

- কোথায়?

-আক্কাসের দাদী তো মরেনি, মরেছে অন্য একজন। তবে এ বুড়িরও বেশি দিন নেই। আছাড় খেয়ে হাঁটু ভেঙেছে, চলতি ফিরতি পারে না। তার ওপরে ধুম জ্বর।

- সে তাহলে বেঁচে আছে?

-মানুষ চিনতে পারবে কিনা তার ঠিক নেই! আমার হাত ধরেন, কাদা সামলাতি পারবেন না।

আরও কিছু গ্রামের লোক জুটে গেল আমাদের সঙ্গে। সবাই আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। যেন আমি সুন্দরবনের এক আজব জানোয়ার।

আমি এরকমভাবে আসতে চাইনি। কিন্তু একেবারে বাইরের মানুষ হয়ে এরকম গ্রামের মধ্যে একা একা আসা বোধহয় সম্ভবও নয়।

যে আমার হাত ধরে আছে সে বললো, বুড়ি ওর নাতির জন্য কেঁদে মরে, কিন্তু আক্কাসটা এমন নিমকহারাম, একবার দেখতে আসে না। একফোঁটা উবগার নেই

ওরে দিয়ে, বরং যত ঝামেলা। আপনাকে তখন ও-কথা কেন বলছিলাম জানেন? কালই সোনারপুর এসেটশনে দুটো বদমাস বলছিল, ওরা এসে গাঁ থেকে আক্কাসকে টেনে বার করবে। ওদের সঙ্গে পুলিশের ষড় আছে তো!

–আক্কাস বাজারে ডিম বেচতে গেলেই পারে?

–ওর তেজ বেশি। সে ওগুলোনের সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি করতে চায়। ঐ যে বাড়ি।

এ বাড়িটি গ্রামের এক টেরেয়। সুকুমার রায়ের কবিতায় বুড়ির বাড়ির যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে খুব একটা অমিল নেই। দেখলেই বোঝা যায়, এ বাড়ির সব কিছুর পতন আসন্ন।

একটিই মাত্র ঘর, তার সামনে এক চিলতে উঠোন। সেই উঠোনে একটা মুরগি তুর তুর করে ঘুরছে। এই মুরগিরই প্রথম ডিম বুড়ি আমাকে দিয়েছিল।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। একটা মাদুর না কী যেন পাতা, তার ওপরে শুয়ে আছে বুড়ি। দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরেই বুকটা ধক করে ওঠে। মনে হয়, ওর প্রাণ নেই।

দিন্দা বললো, সবাই মিলে ঘরে ঢুকো নে। এত ভিড় করতে বারণ করো!

ময়না ভেতরে গিয়ে বুড়ির কপালে হাত দিল। ঠোঁট উল্টে বললো, গা একেবারে পুড়ে যাচ্ছে।

তারপর আস্তে আস্তে বুড়িকে ঠেলা দিয়ে বললো, ও দাদীমা, ওঠো! চোখ খোলো! দ্যাখো, কে এয়েছে?

বুড়ি বিপন্ন মিনমিনে গলায় বললো, কে রে? ময়না? আর বেটি আমার যাওয়া হয় না, পায়ে চোট লেগেছে।

–দ্যাখো না। আর কে এয়েছে!

–কে রে, কে? আক্কাস? এলি? কই রে?

–আক্কাস নয় গো। তোমার আর এক নাতি। ঐ যে গো বাজারে যার সঙ্গে নাতি পাতিয়েছিলে।

– কে/ কার কথা বলছিস?

–বাঃ, মনে নেই, তোমার সঙ্গে কত ভাব, সেই ছোকরা বাবুটা, তুমি যাকে বেছে বেছে সরেস মাল দাও গো।

–মাথার ঠিক ত নাই রে আমার। কার কথা বলছিস?

দিন্দা আমার পিঠে চাপ দিয়ে বললো, যান, বাবু, কাছে যান। আপনারে দেখলে চিনবে।

আমার লজ্জা করছিল। তবু আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে বললুম, কেমন আছো, বুড়ি মা?

আমার গলার স্বর শোনামাত্র চিনলো। ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কে? আমার বাবা এয়েছো? ওরে আমি কী করি! সত্যি সত্যি এয়েছো? অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছিনি, ওরে ময়না, জানলাটা খুলে দে না.. হা আমার কপাল! আমি ভাবলুম, বাজারে তো আর যেতে পারবো না কোনোদিন, আমার বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না, এসো বাবা, একটু কাছে এসো, মুখখানা দেখি।

আমি হাঁটু গেড়ে পাশে বসে বললুম অনেকদিন তোমার খোঁজ করেছি। তোমার কী হয়েছে?

বুড়ি হাত বাড়িয়ে আমার মাথা ছোঁবার চেষ্টা করে বললো, কিছু হয়নি, বাবা, ভালো আছি। পায়ে একটু জোর হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে মনে কত ভেবেছি তোমার কথা, তুমি আমার বাবা, যদি শেষ দেখাটা না হতো–

আমি মনে মনে বললুম, তুমি স্বপ্নে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলে...।

বুড়ি বললো, ও ময়না, একটা কাজ কর না, মা। আমার বাবা এত দূর থেকে এয়েছে, একটা কিছু খেতে দিবি তো!

–না, না, না, বুড়িমা, আমি একটু আগেই খেয়ে এসেছি।

–তা বললে কী হয়! কিই বা দোবো! ও ময়না, ঐ টিনটা দ্যাখ না। ক'টা নারকোল নাড়ু করে রেখেছিলুম আক্কাসের জন্যে, সে ভালোবাসে। তার থেকে দুটো দে আমার বাবাকে।

ময়না কয়েকটা নারকোল নাড়ু এনে দিল আমার হাতে। বুড়ি বললো, খাও বাবা, খাও, আমার সামনে বসে খাও, আমি একটু চক্ষু ভরে দেখি। ভালো করে এখন দেখতেও পাই না ছাই–

দৃশ্যটা যেন সত্যি নয়, অলৌকিক। লক্ষ্মীপুজোর আগের রাত্রে আমার দিদিমা আমাকে নারকোল নাড়ু এনে দিতেন। অবিকল তাঁকেই দেখতে পাচ্ছি যেন সামনে। ঠিক একই রকম প্রাচীন স্নেহ।

নারকোল নাড়ু মুখে তুলবার আগে মনে মনে বললুম, বুড়ি, তোমরা হারিয়ে যেও না! আমি আর কী দিতে পারবো, অতি সামান্য ভালোবাসা, তাই নাও, হারিয়ে যেও না!